মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR

রেজিঃ নং- ১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-০৩

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

এপ্রিল ২০১৪ইং, জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হিঃ, চৈত্র ১৪২০বাং

جمادى الاخرى ١٤٣٥ ابريل ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়ঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল :monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :............................ ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৫
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৬
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত : ফিতনার এই যুগে- ৭
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ: বিভ্রান্তি ও নিরসন-৮
আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ফরজ ১০
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৩........... ১৩
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
তাবলীগি কাজের সূচনা ১৭
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী
লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবিস্মরণীয় কীর্তি ২১
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী
ডিভোর্সের নেপথ্য কারণ ২৯
মুফতি মুহাম্মাদ শোয়াইব
এপ্রিল ফুল বনাম মুসলিম উম্মাহ........................ ৩৬
মুফতী মুর্তাজা
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪২
ইসলামে মানবাধিকার-২ .... ৪৬
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মোবাইলঃ প্রধান সম্পাদকঃ ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদকঃ০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদকঃ ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদকঃ ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিঃ ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৪

সম্প্রতি মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্স। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উলামায়ে কেরাম, ইমাম ও খতীবগণ এতে অংশ নেন।

লা-মাযহাবী ফিতনার সূচনা উপমহাদেশে ইংরেজ আমল থেকে আরম্ভ হলেও উলামায়ে কেরামের সচেতন পদচারণ ও প্রতিরোধী ভূমিকায় এই ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি নিকট অতীতেও। সম্প্রতি বাংলাদেশে এই ফিতনার শিকার হয়ে কিছু সাধারণ মুসলমানদের দিকভ্রান্তের মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে দেখা যায়। দেখা যায়, বিভিন্নভাবে ইসলামের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অপপ্রচার চালাতেও।

সম্ভবত এ কারণে পাঁচ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সে উলামায়ে কেরাম, হযরাতে ইমাম ও খতীবগণের মাঝে লক্ষ করা যায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। একেকটা অধিবেশনের দীর্ঘ বৈঠকেও তাদের মাঝে দেখা যায় অত্যন্ত ধৈর্য, একাগ্রতা এবং এক গম্ভীর পরিবেশ।

এ কোর্সের প্রশিক্ষক ছিলেন আকাবেরে দারুল উলূম দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধ মিশনের অন্যতম সফল প্রশিক্ষক, প্রখ্যাত হাদীস ও ফিক্বহ বিশারদ, মুনাযিরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ মা'সূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেব, ভারত।

হযরত মাওলানা দেখতে অনেক সাদামাটা হলেও আপন বিষয়বস্তুতে মাশা'আল্লা অত্যন্ত অভিজ্ঞ, পারদর্শী এবং ব্যাপক ইলমের অধিকারী। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত মোহাজারায় উপস্থিত উলামায়ে কেরামকে লা-মাযহাবী ফিতনার ভয়াবহতা, এই ফিতনার প্রসারে ইসলাম ও মুসলমানদের ভয়ংকর পরিণতি এবং এই ফিতনার যোগসূত্র ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ তাকরীর পেশ করেন। আহলে সুন্নাতওয়াল জামাআতের প্রতিপক্ষ সেজে এই ফিতনায় আক্রান্ত লোকজন যে সকল শরয়ী বিষয় নিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকে, সেসব বিষয়ে তাদের দালিলিক ভিত্তি, উদ্দেশ্য এবং উক্ত বিষয়সমূহে আহলে সুন্নাতওয়াল জামাআতের ধারাবাহিক আমল, সেগুলোর দালিলিক ভিত্তি ইত্যাদির ওপরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

তাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি ছিল মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট ফিতনাসমূহ নির্ণয়ের মৌলিক পন্থা। এটি পরিষ্কার করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইসলামের নামে মুসলমানের মুখোশ পরে দুনিয়াতে যতগুলো ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সবার মূলে সাহাবাবিদ্বেষ, সাহাবাদের পন্থা থেকে সরে আসা এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথে আমলী, আন্তরিক এবং চিন্তাধারাগত বৈরিতা পোষণ ইত্যাদি সক্রিয়।

তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি কি না? যারা এ ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে, তারা সাহাবাবিদ্বেষী। এরূপ সাহাবাবিদ্বেষ যাদেরই থাকবে, তারা সঠিক ইসলামের পথে থাকতে পারে না। যাদের বিভিন্ন আমল সাহাবায়ে কেরামের আমলে পাওয়া যায় না বরং নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলো বিদআত। এটিও একটি বড় ফিতনা। সুতরাং বর্তমান দুনিয়ায়ও যারা বিভিন্ন বিদআত কাজে জড়িত, যাদের এসব আমলের ধারাবাহিকতা সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে না, তারা ইসলামের সঠিক পন্থায় নেই। বরং এটিও একটি ফিতনা। যারা সাহাবায়ে কেরামের আমল, তাঁদের ইজমা, তাঁদের শিক্ষাকে ইসলামের সঠিক পন্থা হিসেবে গ্রহণ করবে না, তারাও সঠিক ইসলাম থেকে অনেক দূরে। তাদের কার্যক্রমও ফিতনা হিসেবে পরিগণিত হবে। তদুপরি যারা সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মন্দ বলে, সাহাবায়ে কেরামের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করে নিজের মতামতকে ধর্মীয় বিষয়ে প্রাধান্য দেয়, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের ক্ষেত্রে নিজের বুঝকে সাহাবায়ে কেরামের বুঝের ওপর প্রাধান্য দেয়, তারা হলো মুসলিম দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় ফিতনা। যারা মনে করে ইসলাম পালনে সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও আমলের কোনো প্রয়োজন নেই, তথা নিজেদেরকে সাহাবায়ে কেরাম থেকে ঊর্ধ্বে মনে করে, তারাও ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বড় ফিতনা।

কারণ রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং উম্মতের মাঝে সাহাবায়ে কেরামই হলেন দ্বীন পাওয়ার প্রধান মাধ্যম। সুতরাং মধ্যবর্তী এই সিঁড়ি বাদ দেওয়া হলে দ্বীনের আর কিছুই বাকি থাকবে না। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কুরআন শরীফে খোদ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। (সূরা- হুজুরাত-৩)

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما هم فى شقاق

অর্থাৎ, যদি তারা ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা হঠকারিতায় রয়েছে।–সূরা বাক্বারা-১৩৭

এই আয়াতে সাহাবীদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান সে রকম ঈমান, যা রাসূলের সাহাবীগণ অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

لا تمس النار مسلما رانى أو راى من رانى

জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে দেখেছে (অর্থাৎ আমার সাহাবীরা) কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে (অর্থাৎ তাবেয়ীরা)।

(তিরমিযী-২খ./২২৫ পৃ. হাদীস নং-৩৮০১; মিশকাত-৫৯১ পৃ.)

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم

"আমার সাহাবীরা আকাশের তারকাতুল্য। তোমরা তাদের যেকোনো একজনের অনুসরণ করবে, হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

(রাযীন, মিশকাত-৫৫৪)

সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলে, তা স্বয়ং নবীজির প্রতি বিদ্বেষ পোষণের নামান্তর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

فمن أحبهم فبحبى أحبهم و من أبغضهم فبغضى أبغضهم

"...যারা (আমার) সাহাবাকে ভালোবাসল, তারা আমার ভালোবাসায় তাদেরকে ভালোবাসল এবং যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, তারা আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল। (তিরমিযী-২খ./২২৫ পৃ.; হাদীস নং-৩৭৯৭; মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং-১৯৬৬৯ ও ১৯৬৪১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

إذا رأيتم الذين يسبون أصحابى فقولوا لعنة الله على شركم

যখন তোমরা ওই সব ব্যক্তিকে দেখবে, যারা আমার সাহাবাকে গালমন্দ করে, তখন তোমরা বলে দাও, তোমাদের এই মন্দ আচরণের কারণে তোমাদের ওপর আল্লাহর লা'নত।

(তিরমিযী-২/২২৫ মিশকাত-৫৫৪)

এরূপ অসংখ্য আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঠিক ইত্তিবা সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণের মাধ্যমে হবে। তাঁদের বাদ দিয়ে যতই আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইত্তিবা অনুসরণের কথা বলা হোক না কেন, সবই ফিতনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এসব বিষয় অবতারণার মাধ্যমে মেহমান বলেন, ইতিহাসের পাতার ওপর নজর ফেরালে দেখা যায়, ইসলামের নামে যত বাতিল ফিরকা এসেছে, এর বেশির ভাগই বাতিল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সাহাবা বিদ্বেষের কারণে। মুসলমানগণ এই মাপকাঠিতেই তাদের বাতিল এবং ফিতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই যে লা-মাযহাবী ফিতনা, তাদের সাথে আমাদের মূল বিষয় এটি নয় যে, তারা মাযহাব মানে না। বরং তারা মাযহাব না মানার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে মানে না। তাদের সাথে ইসলামের মূল দ্বন্দ্ব এটিই। তারা যেমন সাহাবায়ে কেরামের মতের ওপর নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে থাকে। এর প্রমাণ তাদের লিখিত অগণিত কিতাবে বিদ্যমান।

সাহাবা বিদ্বেষের ওপর যে দলই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে দল যে লেভেল আর মোড়কেই হোক না কেন, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ এবং তারা মুসলিম উম্মাহের জন্য বাতিল এবং ফিতনা বলে পরিগণিত।

আমাদের কথা হলো, উপমহাদেশের হক্কানী উলামায়ে কেরাম তথা উলামায়ে দেওবন্দ সব সময় ইসলাম বিরোধী যেকোনো ফিতনার প্রতিরোধ করেছেন। তাদের সাহসী ভূমিকার কারণে আজ আমাদের পর্যন্ত সঠিক ইসলামের সুঘ্রাণ পৌঁছেছে। আজও সে আবনায়ে দেওবন্দ দুনিয়াব্যাপী সঠিক ইসলামী আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশে হাজার হাজার কওমী মাদরাসা এই আদর্শধারার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এ দেশেও যেকোনো ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে মুসলমানদের ঈমান রক্ষা করার জন্য হক্কানী উলামায়ে কেরাম ওই ফিতনার মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছেন। এটি আমাদের জন্য বড়ই সৌভাগ্য এবং সুখবর।

সুতরাং লা-মাযহাবিয়্যাতের এই মহাফিতনা প্রতিরোধে সকল উলামায়ে কেরামকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে। এ বিষয়ে দেশের মুসলমানদের সচেতন করতে হবে। প্রয়োজনে দেশের শীর্ষ উলামায়ে কেরামের একটি ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্র তৈরি করে মুসলিম উম্মাহকে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন করার লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আরশাদ রহমানী

ঢাকা।

০১/০৪/২০১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

মুমিনদের পরস্পর সম্পর্ক

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।" (সূরা আলে ইমরান ২৮)

এই বিষয়বস্তুটি কুরআনের বহু আয়াতে সংক্ষেপে এবং কোনো কোনো স্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখে শুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মুসলমানদের ধর্মে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার প্রদর্শনেরও কোনো অবকাশ নেই? পক্ষান্তরে এর বিপরীতে কুরআনের অনেক আয়াত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যা সাহাবিগণের আচরণ থেকে অমুসলিমদের সাথে দয়া, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমনসব ঘটনাবলিও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল। এসব দেখে একজন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানও এ ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলিতে পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘর্ষ অনুভব করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার কোরআনী শিক্ষার প্রতি অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কুরআনে বিভিন্ন স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্রিত করে গভীরভাবে চিন্তা করলে অমুসলিমদের অভিযোগও দূর হয়ে যায় এবং আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ উদ্দেশ্যে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রতিটির স্বরূপ জানা যাবে। আরো জানা যাবে তার কারণ কী কী?

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি স্তর হলো, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অমুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নেই।

দ্বিতীয়ত, সমবেদনার স্তর। এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে এবং যুদ্ধরত অমুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অমুসলিমের সাথেও স্থাপন করা জায়েয।

সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে, যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূতি থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।

তৃতীয়ত, সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধন করা অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অমুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতে الا ان تتقوا منهم تقه বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। তবে যদি তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে বন্ধুত্ব করতে চাও, তাহলে জায়েয। সৌজন্যভাবও বন্ধুত্বের হয়ে থাকে। এজন্য একে বন্ধুত্ব থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। বয়ানুল কুরআন-হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী।

চতুর্থত, লেনদেনের স্তর। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব অমুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তবে জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। ফিকাহবিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকরি প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাকরি করা সবই জায়েয।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাহমাতুল্লিল আলামীন হয়ে জগতে আগমন করেন। তিনি অমুসলিমদের সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে শত্রুরা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করেন। এরপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে সব শত্রু তাঁর করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একথা বলে সবাইকে মুক্ত করে দেন যে, لاتثريب عليكم اليوم আজ তোমাদের শুধু ক্ষমাই করা হচ্ছে না, বরং অতীত উৎপীড়নের কারণে তোমাদের কোনোরূপ ভর্ৎসনাও করা হবে না। অমুসলিম যুদ্ধবন্দি হাতে আসার পর তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না। কাফেররা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর হাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কখনও উত্থিত হয়নি।

হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের মতো অমুসলমান দরিদ্র জিম্মিদেরও সরকারি ধনাগার থেকে ভাতা প্রদান করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবনে এ-জাতীয় অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ইসলামী বিধিবিধানের দাওয়াত প্রদানে ধারাবাহিকতা ও ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتى قوما من اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هم اطاعوا لك بذالك فاخبر هم ان الله قد فرض عليكم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لك بذلك فاخبر هم ان الله قد فرض عليكم صدقة توخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب (رواه البخارى ومسلم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামান পাঠালেন, তখন তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে বললেন, তুমি সেখানকার আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে আহ্বান করবে যে, তারা যেন মনেপ্রাণে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তারা যদি তোমার এই কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে বলে দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। তারপর তারা যখন তোমার এ কথাও মেনে নেবে, তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর যাকাতও ফরজ করেছেন, যা তোমাদের বিত্তবানদের থেকে নেওয়া হবে এবং তোমাদেরই গরিব ব্যক্তিদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তারা যদি তোমার একথাটিও মেনে নেয়, তাহলে (যাকাত সংগ্রহ করার সময় বেছে বেছে) তাদের মূল্যবান সম্পদ নিয়ে নেবে না। আর মজলুমের বদদু'আকে ভয় করো। কেননা, তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা ও অন্তরায় থাকে না।

এই হাদীস শরীফে দ্বীনের দাওয়াত ও ইসলামের শিক্ষা প্রচারের বেলায় একজন দাওয়াতদানকারী ও শিক্ষককে যে ক্রমধারা ও ক্রমোন্নতির নীতি অনুসরণ করতে হয়, হযরত মু'আয (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা শিক্ষা দিয়েছেন। নীতি হচ্ছে ইসলামের সকল বিধিবিধান ও আবেদন এবং শরীয়তের সকল আদেশ-নিষেধ একসাথে মানুষের সামনে তুলে ধরবে না। কেননা, এমন করলে ইসলাম গ্রহণ করাই মানুষের জন্য কঠিন মনে হবে। বরং সর্বপ্রথম তাদের সামনে তাওহীদ ও রেসালাতের বিষয় পেশ করবে। যখন তারা এটা গ্রহণ করে নেবে, তখন তাদেরকে বলা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যিনি আমাদের এবং তোমাদের একক রব তিনি আমাদের সবার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। তারপর তারা যখন এ বিষয়টিও মেনে নেবে, তখন বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্পদে যাকাতও ফরজ করেছেন, যা সমাজের বিত্তবানদের থেকে আদায় করে অভাবী শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে।

ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা প্রসঙ্গে এই দিকনির্দেশনা দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'আয (রা.)-কে একটি উপদেশ দিলেন যে, যখন যাকাত সংগ্রহ করার সময় আসবে, তখন এমনটি করতে যাবে না যে, মানুষের সম্পদ তথা উৎপন্ন ফসল ও গবাদি পশুর মধ্য থেকে কেবল উত্তম ও মূল্যবান জিনিসগুলো বাছাই করতে যাবে বরং যে প্রকার সম্পদ হবে, সেখান থেকে মধ্যম মানের জিনিসটি আদায় করবে।

সর্বশেষ উপদেশ তিনি এই দিয়েছেন যে, দেখ মজলুমের বদ্‌দু'আ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। (অর্থ এই যে, তুমি একটি অঞ্চলের শাসক হয়ে যাচ্ছ। তাই সাবধান, কখনো কারো প্রতি জুলুম হয়–এমন কাজ করবে না) কারণ মজলুমের দু'আ এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোনো পর্দা ও অন্তরায় থাকে না, সেটা কবুল হয়েই যায়।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন, মজলুমের দু'আ কবুল হয়েই থাকে। সে যদি পাপাচারীও হয়। পাপাচারী হলে তার পাপের ভোগান্তি তারই জন্য থাকবে। (ফতহুল বারী, উমদাতুল কারী)

এই হাদীসে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত ও রেসালাতের ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর আনীত শরীয়তের ওপর চলা পূর্ববর্তী ও পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহের অনুসারী আহলে কিতাবের জন্যও জরুরি। পূর্ববর্তী ধর্মমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। অনেক মুসলিম স্কলার বলে যে, "ইহুদী-খ্রিস্টানদের মতো সম্প্রদায়গুলো তাদের পুরনো শরীয়ত অনুসরণ করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের মুক্তি লাভ করতে পারবে এবং তাদের জন্য ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ জরুরি নয়।" এ ধরনের মত পোষণকারীরা হয়তো দ্বীন এবং দ্বীনের মূলনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা আসলে এরা মুনাফেক। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মোট কথা, প্রতিটি বিষয়ে একটি ধারাবাহিকতা থাকে। এই হাদীস শরীফের মাধ্যমে আমরা দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং দ্বীনি শিক্ষা দানের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করলাম।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

আরবী বর্ণের গুরুত্ব :

বর্ণের গুরুত্ব অপরিসীম। খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব। আপনি কোনো মাদরাসায় গিয়ে সামান্য সময়ের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ছাত্রদের বলেন, তোমরা লেখো, قمر كو مال دو সে লেখল كمر كو مل دو তাহলে এই ছাত্র কি কোনো নাম্বার পাওয়ার যোগ্য? কখনও আপনি তাকে নাম্বার দেবেন না। বরং তাকে ফেল করে দেওয়া হবে। কারণ পরীক্ষায় সে ভুল করেছে। তার লেখার মধ্যে পার্থক্য কী? একটি হলো ق এর স্থলে সে ك লেখেছে। দ্বিতীয়ত مـــــــا শব্দ থেকে সে আলীফ ফেলে দিয়েছে। দেখেন! উর্দু বর্ণের মধ্যে একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহার করার কারণে আপনি তাকে ফেল করে দিচ্ছেন। সেখানে পবিত্র কুরআন পাঠের সময় যদি এক বর্ণের স্থলে আরেক বর্ণ উচ্চারণ করে, খাড়া যবরকে না টেনে পড়ে ফেলে তাহলে সেরূপ তেলাওয়াতে প্রতিটি বর্ণে ১০টি করে নেকীর আশা করা অবান্তর। এরূপ তেলাওয়াতকে লাহনে জলী বলা হয়।

পবিত্র কুরআন তাজবীদ ছাড়া তেলাওয়াতের শরয়ী বিধান :

জামালুল কুরআনে হযরত থানভী (রহ.) লেখেন, এক বর্ণের স্থলে অন্য বর্ণ উচ্চারণ করল, যেমন الحمد এর স্থলে الهـــمـــد পড়ল, বা ث এর স্থলে س উচ্চারণ করল, ض এর স্থলে د উচ্চারণ করল, ظ এর স্থালে ذ অথবা ز উচ্চারণ করল অথবা কোনো বর্ণ সংযুক্ত করে পড়ল যেমন الـحـمـد এর দালের পেশ এবং الـلـــه হায়ের জেরকে এত টেনে পড়ল, যার দ্বার তা الـحـمـدوللهى হয়ে গেল, অথবা টানার স্থলে সংক্ষিপ্ত করে ফেলল, যেমন يـوُلـد কে পড়ল يُـلـد , অথবা সাকিনের স্থলে যের পড়ে ফেলল, যেমন اهـدنـا এর হা'তে যের উচ্চারণ করল, انـعـمـت এর মীমের সাকিনকে এমনভাবে উচ্চারণ করল, যাতে তাতে যবর বোঝা যায় ইত্যাদিকে লাহনে জালী বলা হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম।

কুরআনের শিক্ষক অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক :

বর্তমানে সামান্য কাজের জন্যও লোক রাখা হয়। যেমন কারো বাথরুমে ছাদ দেওয়ার প্রয়োজন। তখন আপনি এই বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের খোঁজ করবেন। কারণ ছাদ তৈরির সময় যদি তাতে কোনো প্রকার সমস্যা হয় তবে ওই ছাদ ভয়ের কারণ হতে পারে। সে কারণেই মূলত অভিজ্ঞ লোক খোঁজা হয়। কিন্তু যখন পবিত্র কুরআনের শিক্ষক, বা আযান দেওয়ার জন্য মুআযযিন খোঁজা হয়, তখন কম মূল্যে কিভাবে তা সমাধান করা যায়, সে চিন্তা করা হয়। ডাক্তার দামি, মেয়ের জামাই বড় লোক, ওয়াকীল অভিজ্ঞ, স্ত্রী সুন্দর, দামি দোকান ইত্যাদির কথা চিন্তা করা হয় কিন্তু মুআযযিন এবং কুরআনের শিক্ষক সস্তা কিভাবে পাওয়া যাবে, সে চিন্তা করা হয়। এ ক্ষেত্রে দামি লোকের কথা চিন্তা করা হয় না। অথচ পবিত্র কুরআন যদি ভুল শিক্ষা দেয় তবে নিজের সব ইবাদতই নষ্ট হয়ে যাবে, সে চিন্তা করা হয় না। সুতরাং পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য দামি শিক্ষক খোঁজা অন্যান্য কাজের চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের অনেক কিছু এর সাথে সম্পৃক্ত।

পবিত্র কুরআনের সম্মান হ্রাস পাচ্ছে :

কুরআন মজীদের ব্যাপারে আরেকটি হক কথা বলছি। তা হলো পবিত্র কুরআনের মূল্যায়ন ও সম্মান। আমাদের যদি চোখে বা বুকে রোগ হয় তবে উন্নত চিকিৎসার প্রতিই ধাবিত হই। এমনকি আপন শহর ছেড়ে অনেক দূরে গিয়েও এর চিকিৎসার কথা চিন্তা করা হয়। চিন্তা করা হয় ডাক্তার কেমন অভিজ্ঞ, তাদের কাছে উন্নত যন্ত্রপাতি আছে কি না ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে সব বিষয়ে সস্তার দিক লক্ষ্য করা হয়। তাতে বোঝা যায়, পবিত্র কুরআনের যেরূপ মূল্যবোধ ও সম্মান অন্তরে থাকার প্রয়োজন সে পরিমাণ নেই। সুতরাং আমাদের অন্তরে পবিত্র কুরআনের সম্মান ও মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

হাদীস শরীফের তিনটি হক :

দ্বিতীয় বিষয় হলো হাদীসে পাক। এরও তিনটি হক আছে। অন্তরে এর সম্মান থাকা, মুহাব্বত থাকা এবং এর বিধান মতে চলা। আজ সুন্নাতের ক্ষেত্রেও ব্যাপক উদাসীনতা দেখা যায়। এটি তো মাশাআল্লাহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মজমা। আপনারা নিজেরা চিন্তা করে দেখুন এবং ফায়সালা করুন। যদি বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা আলেম-উলামার এই অবস্থা হয় তবে সাধারণ লোকদের কী অবস্থা হবে? আমাদের নামাযের অবস্থা দেখুন। নামায তো আদায় করি; কিন্তু সুন্নাত মোতাবেক নামায আদায়কারী কয়জন আছি। নামাযের সুন্নাত কয়টি, ওজুর সুন্নাত কয়টি? মাদরাসার ছাত্র ছাড়া এসব বলার মতো লোক কয়জনই বা পাওয়া যাবে? তারা তো এসব বিষয় মুখস্ত করে থাকে। তাই তারা বলতে পারে। এখন যারা উপস্থিত আছেন, আপনারা দাঁড়িয়ে নামাযের সুন্নাতগুলো বলুন। আমি এখনই দশ রুপি হাদিয়া দেব। দাঁড়ান, আপনি দাঁড়ান। না কেউ দাঁড়াচ্ছেন না। এখন আপনারা চিন্তা করুন, যদি নামাযের সুন্নাতসমূহও মুখস্ত না থাকে তাহলে অন্যান্য আমলের কী হাল?

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

ফিতনার এই যুগে

চারদিকে নতুনত্বের সয়লাব, বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় অবিশ্বাস্য সব আবিষ্কার দৈনন্দিন বেড়েই চলেছে। পুরো পৃথিবী আজ গ্লোবালাইজেশনের রূপ ধারণ করেছে। প্রতিনিয়ত মানুষের ব্যস্ততা অস্বাভাবিক গতিতে বেড়েই চলেছে। তার প্রতিটি কদম দুনিয়াকে পেছনে রেখে মৃত্যুর দিকে ধাবমান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الاخرة مرتحلة قادمة

অর্থাৎ দুনিয়া প্রস্থানকারী আর আখেরাত আগমনকারী। (শুআবুল ঈমান) হযরত আলী (রা.) বলেন,

ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الاخرة مقبلة

দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর আখেরাত সম্মুখে অগ্রসরমান। (বুখারী)

ভুলে যাওয়ার বাস্তবতা :

শত ব্যস্ততার কারণে মানুষ আজ ওই সময়ের কথা ভুলেই গেছে, যখন তার খালেক তার অস্তিত্ব দান করেন, মাটি-পানিকে মানুষের রূপ দিলেন, মূল উপাদানের সাথে বিবেক-বুদ্ধির সমন্বয় ঘটান, লাভ-ক্ষতি বোঝার শক্তি দান করলেন, সফল এবং অকৃতকার্য হওয়ার পথ নির্ণয় করে দিলেন। ইরশাদ করেন-

وهديٰنه النجدين

বস্তুত আমি তাকে দুটি পথ প্রদর্শন করেছি। (সূরা বালাদ ১০)

নবী-রাসূল প্রেরণের মূল কারণ :

ব্যাপারটি এখানেই শেষ নয়। বরং তার স্বভাব প্রকৃতিতে ভুলভ্রান্তি করার মতো উপাদানও রাখা হয় আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতা জারি রাখেন, যেন কৃত সেই অঙ্গীকার ভুলে না যায়। الست بركم আমি কি তোমাদের রব নই? قالوا بلى উত্তরে সমস্বরে সকলে বলেছিল–হ্যাঁ! আপনিই আমাদের রব। এই ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি খাতামুন্নবীয়্যীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূতঃপবিত্র আগমনের মাধ্যমে হয়। এরই মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত ও নিয়ামত দুটিরই পূর্ণতা দান করেন, যা মহা ইহসান বৈ আর কিছুই নয়। ইরশাদ করেন-

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (সূরা মায়েদা ৩)

চেরাগে হেদায়াত :

ইসলামের আগমন ঘটলে হেদায়াতের চেরাগ উদ্ভাসিত হতে লাগল। কুফর-শিরকের অন্ধকার বিদূরিত হতে শুরু করল। অসভ্যতার যবনিকাপাত হলো এবং বিশ্বজুড়ে ইসলামের প্রভাব/দাপট বিস্তার লাভ করতে থাকল।

অপরিবর্তনশীল সংবিধান :

ইসলাম যেহেতু স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি ধর্ম। তাই মানবজাতির জন্মের পূর্ব থেকে নিয়ে মৃত্যু পরবর্তী বিষয়েও তাকে পথ প্রদর্শন করে থাকে। যারা ইসলামকে শুধুমাত্র ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চায়, তারা নিঃসন্দেহে ভুলের জগতে বিচরণ করে বেড়ায়। এটাও একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, ইসলামে মৌলিক দর্শন এবং আকাঈদের মধ্যে কালের বিবর্তনে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে না। তৌহিদ-একত্মবাদ, রেসালাতের ওপর ঈমান, খতমে নবুওয়াত এবং আখেরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস অতীতে যেমন ফরজ এবং স্থায়ী নাজাতের উসীলা ছিল, তেমনি আজও আছে এবং চিরকাল থাকবে। মৃত্যুর আগেও আছে পরেও থাকবে।

চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র :

পৃথিবীতে একদিকে ইসলামের অস্তিত্ব অন্যদিকে কুফরের অস্তিত্বও বিরাজমান। ইহুদীবাদ, খ্রিস্টবাদ, মুর্তিপূজারী, কবর ও মাজার পূজারী, অগ্নি ও তারকার উপাস্যরা, পাতা-লতা ও চাঁদ-সূর্যকে ইলাহ মান্যকারী এবং অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদীরা প্রত্যেকে সাত্যিকারের আহলে ইসলামকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা এবং উসকানি দেয়ার জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। টেলিভিশনের বড় পর্দা থেকে শুরু করে মোবাইলের ছোট স্কিন পর্যন্ত। রচনা, কলাম, চিকামারা এবং লিফলেট বিতরণ থেকে শুরু করে

বিভিন্ন স্টেজ ও মঞ্চের জ্বালাময়ী বক্তব্য, এমনকি মসজিদের মিম্বরে বসেও। মানসিকভাবে গোলাম বানানোর পাশাপাশি শারীরিক নির্যাতন। মোটকথা হলো, তারা আজ ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধে লিপ্ত।

হাতে গড়া মানুষ :

এত সব ষড়যন্ত্রের মধ্যে আরো ভয়ংকর যে ষড়যন্ত্রটি ইসলামের শত্রুরা করে যাচ্ছে সেটা হলো, প্রতিনিয়ত পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে তাদের হাতে গড়া ও মস্তিস্ক ধোলাই করা ব্যক্তি বা দলের আত্মপ্রকাশ। নতুন নতুন ফেতনা মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই যাদের অভিষ্ট লক্ষ্য। তাই তো দেখা যায়, প্রতিদিন কোনো না কোনো স্কলার, ডাক্তার, ডক্টর, প্রফেসার, মডেল এমনকি পাড়া-মহল্লার সরদার মাতবররাও শরয়ী বিধিবিধান এবং আহলে সুন্নাতওয়াল জামাআতের আকাঈদ বিষয়ে ফতওয়া প্রদান ও কথা বলতে। ব্যাপারটি ক্ষতে লবণ ছিটানোর মতোই। ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল ইসলামের শত্রুরা আর লবণ ছিটালো মুসলিম নামধারী এসব নরাদমরা।

অনুস্মরণীয় :

মনে রেখো হে মুসলমান! তোমাকে তোমার খালেক ও মালিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। দান করেছেন ঈমানের মতো মহা নিয়ামত। তোমাকে কুরআন দিয়েছেন। দিয়েছেন স্বীয় মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফরমান। নমুনাস্বরূপ রেখেছেন নিজের মকবুল বান্দাদের অর্থাৎ সাহাবাদের আমল-আখলাক। সুতরাং তোমাকে বাতিলের ধ্বজাধারীদেরকে ধরাশায়ী করে নিজের আসলাফ ও আকাবেরদের পদাঙ্ক অনুস্মরণ করেই চলতে হবে। বাতিল দু'হাত প্রসারিত করে তোমাকে নিজের পানে ডাকছে। এ ডাকে সাড়া তো দূরের কথা, ফিরেও তাকানো যাবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

ـــ قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يارسول الله صفهم لنا قال هم من جلد تنا ويتكلمون بالستنا ـــ

অর্থাৎ বর্ণনাকারী হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, ...আমি আরজ করলাম, সেই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! জাহান্নামের দুয়ারে দাঁড়িয়ে কতিপয় আহবানকারী লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি আরজ করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বাতলে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতো মানুষ হবে অর্থাৎ নামধারী মুসলমান হবে। এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের কথা বলবে...। (বুখারী, মুসলিম)

মোকাবিলার ক্ষেত্র :

এক. বাতিল পন্থীরা আজ মুসলমানদের জন্য মোকাবিলার বিভিন্ন ক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছে। তন্মধ্যে প্রথমেই আসে আক্বীদার ময়দান। এরপর ইবাদত ও লেনদেনের ময়দান। এসব ময়দানে মোকাবিলার জন্য দ্বীনি মাদরাসাসমূহে ওই শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে, যা মক্কার কুহে সফা, গারে হেরা, মদীনার পূতঃপবিত্র জমীন এবং তায়েফ ও হেজাযের উত্তপ্ত মরুভূমি থেকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আরশে মু'আল্লা পর্যন্ত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেয়েছেন। এখানে কুরআন হাদীসের ওই সব মৌলিক দিক পড়ানো ও শিখানো হয়, যা মানবজীবনের জন্য অতীব জরুরি।

আলহামদুলিল্লাহ! যেসব দোস্ত-আহবাব উলামায়ে কেরামের সাথে ওঠাবসা করেন তারা ভালোভাবে অবগত যে, মাদরাসার উস্তাদ-ছাত্র সকলের যবানে আল্লাহর এই ফরমানই প্রতিধ্বনিত হয়-

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

"সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো, বিক্ষিপ্ত হয়ো না এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী নকল করে থাকে।"

لاتزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لايضرهم من خذلهم حتى ياتى امر الله

হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিজয়ী একটি দল আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় থাকবে। যারা তাদের সহযোগিতা করবে না তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। (তিরমিযী)

বাঁচার উপায় :

চোখ খুলে তাকালে দেখা যায়, আজ আমরা ওই যুগে অবস্থান করছি, যখন চারদিকে ফেতনা আর ফেতনা। ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ তারাই করছে যাদেরকে নববী ভাষায় পথভ্রষ্ট দলের সরদার-নেতা অখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদের কবল থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাতলানো পথে চলা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ

করেন-

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

অর্থাৎ "তোমরা ইতা'আত করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের" اولى الامر দ্বারা আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন উদ্দেশ্য।

হাদীসে বর্ণিত, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ما انا عليه واصحابى অর্থাৎ আমার সুন্নাতের ওপর আমল করো আমার সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করে এবং তাদের আমল দেখে দেখে।

নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই উপমহাদেশে দেওবন্দের অনুসারীরা তথা আহলে সুন্নাতওয়াল জামাআতই এর বাস্তব নমুনা।

উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব :

উলামায়ে কেরামের জন্য এদিকে খেয়াল করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আলেম হিসেবে নির্বাচন করেছেন এবং নবীদের ওয়ারিছ বানিয়েছেন। এ কারণে আমাদের দায়িত্বও তুলনামূলক অনেক বেশি। মৌলিক কয়েকটি দায়িত্ব নিম্নরূপ :

১. রাহবরের বেশে যেসব ডাকুরা জনসাধারণের ঈমান ও আমল হরণে ব্যস্ত তাদেরকে চিহ্নিত করা।

২. জনসাধারণের সামনে ইসলামের সহীহ আকীদা তুলে ধরা।

৩। ইবাদাত বিশেষ করে নামায-সংক্রান্ত সহী আহকাম হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া।

৪. লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা।

৫. সকল বাতিলপন্থী বিশেষ করে লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের ফেতনার মূলোৎপাটনে যথাযথ ভূমিকা পালন করাএবং এর জন্য দলিলভিত্তিক পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

খানেকাহে এমদাদিয়া
আশরাফিয়া আবরারিয়ার
বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা
২৫,২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ইং
২ ,৩ রবিউল আওয়াল ১৪৩৬ হি.
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থান: জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

বিভ্রান্তি ও নিরসন-৮

আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ফরজ

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

১. হযরত নুমান বিন বশীর (রা.) বলেন, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'শুনে রেখো, নিশ্চয়ই শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে, যখন তা সুস্থ থাকে তখন গোটা শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা রোগাক্রান্ত থাকে, তখন গোটা শরীরই অসুস্থ থাকে। শুনে রেখো, সেই গোশতের টুকরা হলো কলব তথা আত্মা।' বুখারী শরীফ হা. নং ৫২, হাদীসটি দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশ বিশেষ।

২. হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কী? তিনি বললেন, নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো, নিজের ঘরে পড়ে থাকো এবং নিজের পাপের জন্য কাঁদো'। (তিরমিযী হা. নং ২৪০৬)

৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'যখন আদম সন্তান ভোরে ওঠে তখন তার অঙ্গসমূহ জিহ্বাকে বিনয়ের সাথে বলে, আমাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আমরা সবাই তোমার সাথে জড়িত। সুতরাং তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হলে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়ব।' (তিরমিযী হা. নং ২৪০৭)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে তখন এর দুর্গন্ধে ফেরেশতারা তার নিকট থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।' (তিরমিযী হা. নং ১৯৭২)

৫. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, সাফিয়্যা সম্পর্কে আপনাকে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এইরূপ এইরূপ। তিনি এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি বেঁটে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'যদি তোমার এই কথাকে সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এটা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দেবে।' (আবূ দাউদ হা. নং ৪৮৭৫)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা কোনো (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, ঠাট্টা করবে না এবং এমন ওয়াদা করবে না, যা রক্ষা করতে পারবে না।' (তিরমিযী হা. নং ১৯৯৫)

৭. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা বদ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ ধারণা হচ্ছে নিকৃষ্ট মিথ্যা। তোমরা আড়ি পেত না, গোপন দোষ অন্বেষণ করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।' (বুখারী হা. নং ৫১৪৩)

৮. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।' (আবূ দাউদ হা. নং ৮৯০৩)

৯. হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন বহুমুখী অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে। আর তোমরা লোভ এবং কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা লোভ ও কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। লোভ ও কৃপণতার বশবর্তী হয়ে তারা পরস্পর রক্তপাত করেছে এবং নিজেদের ওপর হারাম বস্তুকে হালাল করেছে।' মুসলিম হা. নং ২৫৭৮

১০. হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের নেক আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছিত করবেন। আর যে ব্যক্তি এই জন্য লোক সম্মুখে নিজের নেক আমল

প্রকাশ করে যে, মানুষ তাকে মহৎ মনে করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার অন্তরের অবস্থা সকলের সামনে প্রকাশ করে দেবেন।' (বুখারী হা. নং ৬৪৯৯)

১১. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'রাগ করো না'। সে কয়েকবার এই কথা জিজ্ঞাস করল, আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও প্রত্যেক বার একই জবাব দিলেন যে 'তুমি রাগ করো না।' (বুখারী হা. নং ৬১১৬)

১২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'অন্যকে ধরাশায়ী করতে পারলেই বীর হওয়া যায় না; বরং প্রকৃত বীর হলো ঐ ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' (বুখারী হা. নং ৬১১৪)

১৩. হযরত বাহায ইবনে হাকীম (রা.). তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে বিনষ্ট করে, যেমনিভাবে 'ছাবীর' মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।' (ছাবীর এক প্রকার তিতা ফল, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তা পাওয়া যায়।) (তিমিযী হা. নং ৮২৯৪)

১৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের গোস্‌সা দমন করে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ওপর থেকে আযাব সরিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, আল্লাহ পাক তার ওযর কবুল করেন।' (শু'আবুল ঈমান হা. নং ৭৯৫৯)

১৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এমন কোনো ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে। পক্ষান্তরে এমন কোনো ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে।' (মুসলিম হা. নং ৯১)

১৬. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইযার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে দোযখে ঢোকাব। অপর একটি বর্ণনায় আছে তাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করব।' (মুসলিম হা. নং ২৬২০)

১৭. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মানুষ এমনভাবে আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, অবশেষে তার নাম ঔদ্ধত-অহংকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, ফলে তার ওপর সেই আযাবই নেমে আসে, যা তাদের ওপর নেমে থাকে।' (তিরমিযী হা. নং ২০০০)

১৮. হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো এক-এক বিঘত ও এক-এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে, এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও এ ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কি ইহুদ ও নাসারা! তিনি বললেন, তবে আর কারা!? (বুখারী হা. নং ৩৪৫৬)

উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষের শরীরের মতো মানুষের অন্তরও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যেসব রোগের একেকটি এত বেশি ক্ষতিকর যে, একটি রোগই যেকোনো মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই শরীর রোগাক্রান্ত হলে যেমনিভাবে আমরা তার চিকিৎসা করে থাকি, তেমনিভাবে আত্মা রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা করাও জরুরি। বরং আত্মার রোগের চিকিৎসা শরীরের রোগের তুলনায় অনেক বেশি জরুরি।

কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা আত্মার রোগের চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন : قد افلح من زكها ' যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাবে সে সফলকাম হবে। ' (সূরা শামস-৯)

এই আয়াতের তাফসীরে হাসান বসরী (রা.) বলেন,

قد افلح من زكى نفسه :معناه فاصلحها و حملها على طاعة الله. تفسير المظهرى ২৪৭/১০

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সফলকাম হবে ওই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাবে তথা আত্মাকে সংশোধন করাবে এবং আত্মাকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর উদ্বুদ্ধ করবে।

তাফসীরে মাজহারী ১০/২৪৭

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাতে বলেছেন। বোঝা গেল যে, আত্মা একা একা পরিশুদ্ধ হয় না; বরং কোনো আহলে দিল বুযুর্গের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করাতে হয়। তাই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে নিজেদের আত্মার চিকিৎসা করিয়েছেন, পরিশুদ্ধ করিয়েছেন। নিজের আত্মার চিকিৎসা নিজে করেননি। তাই আমাদের জন্য ফরজ হলো কোনো হক্কানী, রব্বানী, নায়েবে নবীর মাধ্যমে নিজ আত্মার চিকিৎসা করানো। শরীরের রোগের চিকিৎসার জন্য যেমনিভাবে আমরা ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়ে থাকি, ঠিক তেমনিভাবে আত্মার রোগের চিকিৎসার জন্য যারা আত্মার রোগের পরামর্শপত্র দেন তাদের দ্বারস্থ হতে হবে। হ্যাঁ

পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আত্মার রোগের চিকিৎসা করা ফরজ আর শরীরের রোগের চিকিৎসা করা সুন্নাত। যারা আত্মার রোগের চিকিৎসা না করেই মারা যাবে তাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : وقد خاب من دسها 'আর ব্যর্থ কর্ম হবে সে, যে আত্মাকে (গুনাহের মধ্যে) ধসিয়ে দেবে।' (সূরা শামস-১০) তা ছাড়া ১৮ নং হাদীসেও তাদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে এসে আত্মার চিকিৎসা না করালে ইহুদী-খ্রিস্টানদের অনুসরণ করতে বাধ্য করা হবে।

আর নিম্নবর্ণিত হাদীসে আত্মার রোগের চিকিৎসা না করার কারণে শহীদ, আলেম ও দানবীরদের করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে হবে একজন শহীদ (ধর্মযুদ্ধে প্রাণদানকারী)। তাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আনা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে (প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত) নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন; আর সেও তা (নেয়ামত প্রাপ্তির কথা) স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এসব নেয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়াতে কী আমল করেছো? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করোনি; বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছ যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে (ফেরেশতাদেরকে) আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দ্বীনি ইলম শিখেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে আর সে কুরআন শরীফও পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকেও দুনিয়ার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তুমি কী আমল করেছো? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং অপরকেও তা শিখিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মজীদ পড়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এজন্য ইলম শিখেছো, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় আর এজন্য কুরআন পড়েছো, যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে, যাকে আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের অর্থ-সম্পদ দান করে বিত্তবান বানিয়েছিলেন। তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এ সমস্ত নেয়ামতের মোকাবিলায় তুমি আমার জন্য কী করেছো? সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো তার একটিও আমি হাতছাড়া করিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এজন্য দান করেছো, যাতে করে তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানা হবে অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (সহীহ মুসলিম হা. নং ১৯০৫)

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত হলো, নিজ আত্মার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। কোনো হক্কানী পীর বা শায়খকে নিজ আত্মার অবস্থা জানিয়ে আত্মার চিকিৎসা করা। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৩

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

মুদ্রার বিধিবিধানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিধান যেহেতু সুদের সাথে সম্পৃক্ত, যেমনটি সামনের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাবে। তাই এবার সুদসংক্রান্ত কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সুদের সংজ্ঞা :

সুদ আভিধানিক অর্থে অতিরিক্ত ও উদ্বৃত্তকে বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞায় দুই অর্থে এটি ব্যবহৃত হয় –

১. ربا الفضل রিবাল ফাজল বা পণ্য বিনিময়সংক্রান্ত সুদ।

২. ربا النسيئة রিবান নাসিয়াহ বা বিলম্বজনিত সুদ যাকে রিবাল কুরআন, রিবাল জাহিলিয়্যা ও রিবাল করজ্বও বলা হয়।

আর রিবাল ফজলকে রিবাল হাদিস এবং রিবাল বাইও বলা হয়।

রিবান নসিয়াহকে রিবাল কুরআন এজন্য বলা হয় যে, কুরআনে কারীমের অনেক আয়াত এই সুদকে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর তাকে রিবাল জাহিলিয়্যাহ এজন্য বলা হয় যে, জাহেলী যুগে তার প্রচলন ছিল এবং ওই যুগের লোকেরাও এটিকে রিবাই বলত। রিবাল করজ এ জন্য বলা হয় যে, তার সম্পর্ক করজের সাথে। কেননা নাসিয়াহ অর্থ ঋণ পরিশোধের জন্য প্রদত্ত সময়।

রিবাল ফজলকে রিবাল হাদিস এজন্য বলা হয় যে, এই প্রকারের সুদের নিষেধাজ্ঞা শুধু পবিত্র কুরআনের শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় না, বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুবারক হাদীস দ্বারা হয়।

রিবাল বাই এজন্য বলা হয় যে, তার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে, কেননা ফজল এর অর্থ হলো আধিক্য।

যেমন আল্লামা ইবনুল আরবী (রহ.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন,

الربا فى اللغة الزيادة والمراد فى الآية كل زيادة لايقابلها عوض (احكام القرآن ابن العربى ٢٤٢/١)

অভিধানে রিবা বলা হয় আধিক্যকে, আর পবিত্র আয়াতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই ধরনের আধিক্য, যার বিপরীতে কোনো বিনিময় থাকে না।

ইবনুল আরাবীর এই সংজ্ঞা রিবান নাসিয়াহ ও রিবাল ফজল উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা এমন অতিরিক্ততা, যা কোনো বিনিময়ের বিপরীতে হয় না। অর্থটি রিবান নাসিয়াহর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ এ ক্ষেত্রে নিজ পাওনা পরিপূর্ণ উসূল করার পর সুদের যে অতিরিক্ততা অর্জিত হয় সেটি বিনিময়হীন।

এই সংজ্ঞা রিবাল ফজলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা এতে দুই বস্তুর লেনদেনে কোনো একদিকে এমন অতিরিক্ততা পাওয়া যায়, যা কোনো বিনিময়ের বিপরীতে হয় না। তাই ইবনুল আরবীর এই সংজ্ঞা তার ব্যাপকতার কারণে উত্তম সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য করা হয়। ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) তাঁর রচিত গ্রন্থ আহকামুল কুরআনে সুদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন–

هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض (احكام القرآن للجصاص ٥٥٢/١)

অর্থাৎ ঋণের ওই লেনদেন যার মধ্যে পরিশোধের নির্দিষ্ট মেয়াদ ও ঋণগ্রহীতার ওপর অতিরিক্ত অর্থ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

আল্লামা জাসসাস (রহ.) আল করজের শর্তযুক্ত করে এই সংজ্ঞাকে রিবান নাসিয়াহর সাথে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

জাস্টিস আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ত্বকী উসমানী (দা. বা.) আল্লামা জাসসাস (রহ.)-এর এই সংজ্ঞা সম্পর্কে লিখেন–

وان هذا التعريف يشمل سائر انواع ربا النسيئة وكان هذا الربا محرما فى سائر الاديان السماوية وتوجد نصوص تحريمه حتى الآن فى مجموعة الكتاب المقدس وراجع سفر الخروج ٢٢:٢٥ وسفر الاحبار ٢٥:٣٥ وسفر التثنيه ٢٣:٢٠ من اسفار التوراة وزبور داود ١٥:٥ وسفر امثال سليمان عليه السلام ٢٨:٨ وسفر نحمياه ٥:٧ وسفر حزقيل عليه السلام ١٨:٨، ١٣، ١٧، ١٢، ٢٢)

এই সংজ্ঞা রিবান নাসিয়াহর সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর এ ধরনের সুদ সমস্ত আসমানী ধর্মে হারাম ছিল, এমনকি তার নিষিদ্ধতার লিখিত বক্তব্য এখনও পবিত্র কিতাবসমূহে পাওয়া যায়, এজন্য দেখা যেতে পারে খুরুজ ২২:২৫, আহবার ২৫:৩৫, তাসনিয়া ২৩:২০, যাবুরে দাউদ (আ.) ১৫:৫।

সফরে আমসালে সোলাইমান (আ.) ২৮:৮ সফরে নাহমিয়া ৫:৭, সফরে হিযকীল (আ.) ১৮:৮.১৩, ১৭, ১২, ২২ (তাকমালায়ে ফতহুল মুলহীম শরহে সহীহ মুসলিম ১/৫৬৭)

রিবান নাসিয়াহর সংজ্ঞা বিধৃত একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ :

"كل قرض جر نفعا فهو ربا" رواه الحارث بن ابى اسامه فى مسنده عن على رفعه

হারেছ ইবনে আবি উসামা তাঁর মুসনাদে হযরত আলী (রা.) থেকে (মারফু) বর্ণনা করেন, ঋণের বিপরীতে সকল ধরনের ফায়দা অর্জন রিবার অন্তর্ভুক্ত। (কাশফুল খফা ২/১৬৪)

উক্ত হাদীস শরীফে যেহেতু করজ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। তাই এর সম্পর্ক রিবাননাসিয়াহর সাথেই হবে।

এই হাদীস যদিও সনদের দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। তবে যেহেতু অন্য বর্ণনা ও হাদীস দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায় তাই এই হাদীস حسن لغيره পর্যায়ের। আর মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট এই হাদীস আমলের উপযোগী বরং উম্মতের পক্ষ হতে তার সমর্থন (تلقى بالقبول) পাওয়া যায়।

যথা মুফতী আযম মাওলানা শফী সাহেব (রহ.) মাসআলায়ে সুদ নামক কিতাবে এই হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীস আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) জামেউস সগীর এ বর্ণনা করেছেন। এবং ফজুলল কদীর শরহে জামেয়ুস সগীর এ যদিও তার সনদের ব্যাপারে সংশয় ব্যক্ত করেছেন এবং তাকে দুর্বল বলেছেন, তবে তার শরাহ, সিরাজুল মুনির আজীজি এই হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন যে, قال الشيخ: حديث حسن لغيره অর্থাৎ এই হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী। কেননা অন্যান্য রেওয়ায়াত ও হাদীস দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায়। সারকথা হলো, এই রেওয়ায়াত মুহাদ্দিসগণের নিকট আমল যোগ্য।

ইমামুল হারামাইন এবং ইমাম গাযালী (রহ.)ও এই হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। (তালখীসুল হাবীর লিল আসকালানী ৩/৯৯৭)

উল্লেখ্য যে, সকল ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসকে একটি উসূল তথা মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণের এই সমর্থন একথার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দলিল যে, এই উসূলটি হুবহু কুরআন-হাদীস অনুযায়ী, তাই কিছু লেখক ও ওলামাদের এই হাদীসকে অন্য হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বলা কিংবা তার সত্যতাকে অস্বীকার করা মোটেও উচিত নয়।

উল্লিখিত হাদীসে লাভ দ্বারা ওই সব লাভই উদ্দেশ্য, যা শর্তযুক্ত বা প্রথাগত হবে। কেননা প্রথাও কিছু কিছু শরীয়াহ বিধিবিধানের ক্ষেত্রে শর্তের মতোই।

এমনিভাবে ইমাম আবুবকর জাসসাস ও অন্যদের মতে যে সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে المشروط এর বন্ধন এ জন্যই জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া লাভ (মানফা'আত) শব্দটি ব্যাপক, চাই মালের আকৃতিতে হোক বা অন্য কোনো রূপে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, ঋণের বিনিময়ে শর্তযুক্ত বা প্রথাগতভাবে যে ধরনের লাভই অর্জিত হবে তা যে রূপেই হোক না কেন সুদ হবে। তাই এর থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

উল্লিখিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা উক্ত হাদীস থেকে দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

১। বর্ণিত হাদীসে লাভ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শর্তযুক্ত বা প্রথাগত ও জ্ঞাত মুনাফা।

২। মুনাফা শব্দটি ব্যাপক, চাই যে আকৃতিতেই হোক না কেন।

প্রথম কথার দলিল ওই সমস্ত হাদীস ও রেওয়ায়াত, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ (রা.) বেশ কয়েকটি ঘটনায় ঋণ নিয়ে পরিশোধ কালে কিছু কিছু অতিরিক্ত দিয়েছিলেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪র্থ খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠা।)

দ্বিতীয় কথার দলিল এই যে, আইম্মায়ে আরবা'আ (চার ইমাম) এমন অনেক পদ্ধতিকে এই হাদীসের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যাতে ঋণদাতার প্রদেয় ঋণের বিনিময়ে কিছু মুনাফা অর্জিত হয়, অথচ ওই মুনাফা মাল আকৃতিতে হতো না।

উদাহরণস্বরূপ :

১। বন্ধকি বস্তু থেকে শর্তযুক্ত কিংবা প্রথাগতভাবে উপকৃত হওয়া হারাম। (আদ দুররুল মুখতার এবং আর রাদ্দুল মুহতার ১০/৭০)

২। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার অশ্বারোহনের ওপর আরোহন করা কিংবা ঋণের বিনিময়ে তার ঘরে পানাহার করা বৈধ নয়। (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৪/৭২৪)

৩। যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এই শর্তে ঋণ দেয় যে, ঋণগ্রহীতা তার নিকট নিজ ঘর বিক্রি করবে। তখন এটা বৈধ হবে না। (প্রাগুক্ত)

৪। ইমামগণ سفتجة হুন্ডিকে এই হাদীসের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ করেছেন।

অথচ তার মধ্যে অতিরিক্ত কোনো মাল নেই (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৪/৭২৪)

সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে, মানফা'আত (লাভ) যাকে হারাম করা হয়েছে, এর দ্বারা অতিরিক্ত মালই উদ্দেশ্য, যেমন সাম্প্রতিক কালের এক ভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ শায়খ মাহমুদ আহমদ মরহুম, আল্লামা জাসসাস ও অন্যান্যদের সংজ্ঞাগুলোর বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে এমনটি বলেছেন। কেননা ওই সংজ্ঞাগুলোতে মাল শব্দটি রয়েছে। অথচ ওই সংজ্ঞাগুলোতে মালের শর্তটি আধিক্যের ভিত্তিতে বিবৃত হয়েছে, কেননা জাহেলী যুগে অধিকাংশ সুদি লেনদেন এমনই হতো। এখানে মালের শর্তটি কোনো বাধ্যতামূলক শর্ত নয়।

এমতাবস্থায় আল্লামা জাসসাসের সংজ্ঞাও উল্লিখিত হাদীসের (যার মধ্যে মানফা'আত বা লাভের ব্যাপকতা) সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে। এ ছাড়া অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম রিবার সংজ্ঞায় মালের কোনো শর্ত যুক্ত করেনি।

সারকথা, উল্লিখিত হাদীসের আলোকে ঋণের ওপর শর্তযুক্ত বা প্রথাগত মুনাফা গ্রহণ করা, চাই যেকোনো রূপে ও আকৃতিতে হোক না কেন রিবান নাসিয়াহ হবে এবং কোরআন-হাদীসের আলোকে তা নিষিদ্ধ ও হারাম। তা থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক ও জরুরি।

রিবাল ফজল (ربا الفضل) (পণ্য বিনিময়সংক্রান্ত সুদ)

রিবাল ফজল (পণ্য বিনিময়সংক্রান্ত সুদ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই আধিক্য, যা বিশেষ কিছু বস্তুর পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্জিত হয়।

রিবাল ফজলসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদিস যাকে ছয়টি পণ্যবিশিষ্ট হাদীস বলা হয়। এতে ছয় বস্তুর কথা উল্লেখ রয়েছে, যা নিম্নে পেশ করা হলো।

الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلابمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد

স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমপরিমাণে বিক্রি করো। রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে সমপরিমাণে বিক্রি করো। খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে সমপরিমাণে বিক্রি করো। গমকে গমের বিনিময়ে সমপরিমাণে বিক্রি করো। লবণকে লবণের বিনিময়ে সমপরিমাণে বিক্রি করো। জবকে জবের বিনিময়ে সমপরিমাণে বিক্রি করো। তবে যে ব্যক্তি অতিরিক্ত সহকারে লেনদেন করবে, সে সুদের লেনদেন করল। পক্ষান্তরে স্বর্ণকে রুপার বিনিময়ে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারো, তবে নগদে হওয়া শর্ত। এবং জবকে খেজুরের বিনিময়ে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারো। শর্ত হলো, নগদে হতে হবে। (কানযুল উম্মাল-হাদীস নং ৪৬৬৯)

এই হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে, তবে সবগুলোর মর্মার্থ একই।

আর সেটা হলো এই, বিশেষ বস্তুর পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো একপক্ষ অপরপক্ষের তুলনায় অতিরিক্ত নেওয়া ও দেওয়া থেকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। এই হাদীসে শুধু ছয় বস্তুর কথা উল্লেখ আছে। তবে সকলে একথার ওপর একমত যে, রিবা শুধু এই ছয় বস্তুর সাথে সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য জিনিসও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

অন্তর্ভুক্তির মানদণ্ড :

এজন্য মুজতাহিদগণ তালীলের সাহায্য নিয়েছেন। অর্থাৎ উপর্যুক্ত হাদীস গবেষণা করা হলো যে, ওই বস্তুগুলোর পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্তকে কোনো علت বা কারণের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে? সুতরাং প্রত্যেক মুজতাহিদগণ গবেষণা করে নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী কারণ নির্ণয় করেছেন এবং ওই কারণ এর ওপর ভিত্তি করে অনেক বিধিবিধান নির্ণয় করেছেন। যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ফিকহ ও উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুদ হারাম হওয়ার দলিলসমূহের সারমর্ম

☆ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি যাকে শয়তান আছর করে মোহবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেওয়ারই মতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ

এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার। আর তার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয় তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (বাকারা আয়াত ২৭৫)

☆ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم

আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খায়রাতকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে। (বাকারা ২৭৬)

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ☆ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِه

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো, অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। (বাকারা ২৭৮)

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (আলে এমরান ১৩০)

☆ عن ابن مسعودؓ قال: لعن رسول الله ﷺ اكل الربا وموكله وفي رواية لمسلم وغيره لعن رسول الله ﷺ اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদদাতা সুদগ্রহীতার ওপর লানত করেছেন এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদদাতা সুদগ্রহীতা, লেখক ও সাক্ষীদাতার ওপর লানত করেছেন। এবং এটাও বলেছেন যে, তারা সকলে সমান। (বুখারী কিতাবুত তালাক, মুসলিম কিতাবুল মুসাকাত, আবু দাউদ কিতাবুল বুয়ূ)

☆ الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك

সুদের গুনাহ সত্তরের চেয়েও অধিক আর শিরিক তার সমান। (মুসনাদে বাযযার, ইবনে মাজাহ)

☆ الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها فى الاسلام

এক দেরহাম পরিমাণ সুদ আল্লাহর নিকট তেত্রিশ বার যেনা করার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ, যা মুসলমান থাকা অবস্থায় করা হয়। (আততাবরানী আল কাবীর,)

☆ الربا ثلاث وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه

সুদের তেহাত্তর প্রকারের পাপ রয়েছে এর সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পাপ হলো স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (মুসতাদরাকে হাকিম)

☆ ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة

যে ব্যক্তি সুদ দ্বারা নিজের মালকে বৃদ্ধি করবে তার প্রতিফল নিম্নমুখীই হবে। (ইবনে মাজাহ এবং আল হাকিম)

☆ اذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله

যখন কোনো এলাকায় সুদ ও যেনা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়, তখন ওই এলাকার অধিবাসীরা আল্লাহর আযাব নিজের ওপর টেনে নিয়ে আসে। (আল মুসতাদরাক)

☆ مامن قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنة

যে গোত্রে সুদি লেনদেন ব্যাপকতা লাভ করে, তখন অবশ্যই তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে যায়। (মুসনাদে আহমদ)

☆ بين يدى الساعة يظهر الربا

কিয়ামতের পূর্বে সুদ বিস্তার লাভ করবে। (আল মু'জামুত তাবরানী)

☆ ليأتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا فمن لم ياكله اصابه من غباره

কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে, কোনো ব্যক্তিই সুদ খাওয়া থেকে বেঁচে থাকবে না। আর কেউ সুদ ভক্ষণ থেকে বাদ থাকলেও এর ধূলিকণা তাকে স্পর্শ করবেই। (সুনানে আবী দাউদ)

এখানে স্বল্পসংখ্যক পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে, যা শুধুমাত্র নমুনাস্বরূপ। অন্যথায় সুদখোরের শাস্তি সম্পর্কে আরো অসংখ্য হাদীস ও রেওয়ায়াত রয়েছে। যাতে সুদ খাওয়া ও সুদি লেনদেন সম্পর্কে অনেক কঠিন শাস্তির কথা রয়েছে।

হাদীসগুলোর বিস্তারিত জানতে মুফতী আজম মাওলানা মুফতী শফী সাহেব (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ কিতাব মাসআলায়ে সুদ পাঠ করা যেতে পারে, যা বিশেষ করে সুদ সম্পর্কেই লেখা হয়েছে এবং এতে সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস রয়েছে।

(চলবে ইনশা আল্লাহ)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মাধ্যমে
তাবলীগি কাজের সূচনা

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর আব্বার ফিকির ও অন্তরের প্রশস্ততা

ভারতের উত্তর প্রদেশের মুযাফফর নগর জেলার ঝানঝানার অধিবাসী মাওলানা ইসমাইল সাহেব নামক জনৈক বুযুর্গ দিল্লির নিযামুদ্দীন নামক এলাকার ছোট একটি মসজিদে আল্লাহ পাকের স্মরণে মগ্ন থাকতেন। বাচ্চাদের কুরআন পড়াতেন, আর প্রচণ্ড গরমের সময় সেখান থেকে চলাচলকারী

দিন-মজুরদের মাথার বোঝা নামিয়ে তাদের ঠাণ্ডা পানি পান করাতেন তারপর আবার তাদের মাথায় সামানা তুলে দিয়ে বিদায় করতেন। শ্রমিকরা অন্তর থেকে তার জন্য দু'আ করে স্ব স্ব গন্তব্যে পা বাড়াত।

সে সময়ে নিযামুদ্দীনের এলাকা এতটা ঘনবসতিপূর্ণ ছিল না। তখন ছিল বাদশাহ বাহাদুর শাহ যফরের যামানা। মাওলানা ইসমাইল সাহেব সকালের দিকে কখনো কখনো লোকালয়ের দিকে বেরিয়ে যেতেন, যেখানে দিনমজুররা কাজের অপেক্ষায় অবস্থান করত। তিনি তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, কত মজুরি চাও? তারা তিন-চার আনার কথা বলত। তিনি তাদের মসজিদে নিয়ে আসতেন। তারা জিজ্ঞাসা করত মৌলভী সাহেব কী কাজ করব? তিনি তাদের ওযু-গোসল করতে বলতেন। নামায কালাম শিখাতেন, কুরআন তেলাওয়াত শিখাতেন। যারা কালেমা জানে না তাদের কালেমা শিখাতেন। সন্ধার সময় তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় করতেন।

দিনমজুরদের পানি পান করিয়ে এবং তাদের যিকির আর নফল ইবাদতে এবং কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল দেখে তিনি নফল নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট শুকরিয়া আদায় করতেন যে, তিনি আমাকে স্বীয় বান্দাদের খেদমত করার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি মির্যা ইলাহী বখশের বাচ্চাদের পড়িয়ে যে বেতন পেতেন তা এভাবেই পথচারীদের পেছনে ব্যয় করে সামান্য কিছু নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতেন।

মাওলানা ইসমাইল সাহেবের ছেলে ছিল তিনজন। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)-এর খাস খাদেম হযরত মাওলানা ইয়াহয়া, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস এবং মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব। মাওলানা ইয়াহয়া সাহেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)। যিনি মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর থেকে লেখাপড়া শেষ করে সেখানকার শাইখুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন এবং প্রায় ৫৫ বছর বুখারী শরীফের দরস দান করেন। সমগ্র উপমহাদেশে তিনি শাইখুল হাদীস হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৮২ সালে মদীনা শরীফে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা ইসমাইল (রহ.) বস্তী নিযামুদ্দীনের মসজিদে ইমামতি করতেন। তিনি বারোটি গ্রামের জমিদার ছিলেন। কিন্তু সব কিছু ছেড়ে এই নির্জন এলাকায় চলে এসেছিলেন। এখানে যিকরুল্লায় মশগুল থাকতেন আর রাস্তা দিয়ে যেসব মেওয়াতীরা যাতায়াত করত তাদেরকে দুই-দুই আনা পারিশ্রমিক দিয়ে মসজিদে নিয়ে আসতেন। সারা দিন তাদেরকে ওযু-গোসল, নামায-কালাম শিখিয়ে সন্ধায় দু আনা দিয়ে বিদায় করতেন। প্রথম প্রথম মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সাথে মেওয়াতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তীতে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাওলানা ইসমাইল সাহেবের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং এই খিদমত আনজাম দিতে থাকেন। তার ইন্তেকাল হয়ে গেলে মেওয়াতীরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। মারকাজ খালি হয়ে গেল। মসজিদ খালি হয়ে গেল। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) তখন মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরে শিক্ষকতা করছেন। মেওয়াতীরা দলবেঁধে সাহারানপুর উপস্থিত হলো। তারা এই শূন্য জায়গা পূরণ করার জন্য মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-কে অনুরোধ করলে তিনি তাদের ধমক দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। তারা পেরেশান হয়ে মসজিদে বসে ছিল। কেউ বলল, তার পীরের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করো। তিনি হয়তো একটা সমাধান করে দেবেন। হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.) ছিলেন মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের পীর। মেওয়াতীরা কাঁদতে কাঁদতে সেখানে গিয়ে হাজির হলো, বলল হযরত! আমরা তো এতীম হয়ে গেছি। মাওলানা ইলিয়াস সাহেবকে আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিন। হযরত সাহারানপুরী মাওলানা ইলিয়াস সাহেবকে ডেকে বললেন, নিযামুদ্দীনে চলে যাও। কিন্তু তিনি বললেন, আমি তো হযরতকে ছেড়ে যাওয়াটা পছন্দ করি না।

হযরত বললেন, তুমি এক বছরের ছুটি নিয়ে চলে যাও। ভালো লাগলে থেকে যেও, নইলে চলে এসো। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) মেনে নিলেন, এক বছরের ছুটি নিয়ে চলে গেলেন নিযামুদ্দীন। সেখানে আল্লাহ তা'আলা এই বান্দার দ্বারা এমন কাজ নিলেন, যা বিগত শত শত বছর পর্যন্ত হয়নি। তিনি

এক বছরের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন;
কিন্তু তার সারাটা জীবন সেখানেই কেটে গেল। শেষ জীবনে টিবি রোগ হয়েছিল। শরীর এমনিতেই দুর্বল, স্বাস্থ্য ছিল ভঙ্গুর। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, রাতে ৩০-৪০ বার বাথরুমে যেতে হয়েছে; কিন্তু সকালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ৩-৪ ঘণ্টা বয়ান করেছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলার গায়েবী নেযাম চালু হলো। কেননা এই দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে তাই আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এই ফিকির ঢেলে দিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি এই পদ্ধতিতে কাজ শুরু করলেন। উলামায়ে কেরামের সামনে কাজের এই নকশা তুলে ধরলেন। মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) এবং হযরত মাদানী (রহ.) ছাড়া কেউ এটাকে সমর্থন করলেন না। আর এই বুযুর্গদ্বয়ের সমর্থনও ছিল যুক্তিতর্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যে, আপনার পরিকল্পনা তো ঠিক, কিন্তু এভাবে কাজ করবেটা কে?
মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) বললেন, আমাদের তো মানুষ চাঁদাই দিতে চায় না। আর আপনি চান্দাও চাইবেন, বান্দাও চাইবেন, এটা তো সম্ভব না। যাহোক এর দশ বছর পরে চিল্লার জন্য প্রথম জামাআত তৈরি হলো। সেই জামাআতটিকে তিনি দিল্লিতে মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেবের মাদ্রাসায়ে আমিনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। মুফতী সাহেব এই জামাআত দেখে তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অতঃপর এই জামাআতের সাথেই তিনি পায়দল নিযামুদ্দীনে চলে গেলেন।

স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-কে দাওয়াতের কাজ শুরু করার নির্দেশ

মাওলানা ইসমাইল সাহেবের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব দিল্লি চলে এলেন। তখন মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) সাহারানপুরে দরসদানে মশগুল ছিলেন। এ সময়ে তিনি মনে মনে চিন্তা করতেন যে, তালীমি খেদমত তো অনেক হচ্ছে, অন্য কোনো
খেদমতে লাগা দরকার। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) হযরত রশীদ আহমাদ গাংগুহীর হাতে বাইআত ছিলেন এবং তার নিকট হতে অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন। তাকওয়া পরহেযগারীতে অনেক উঁচু মাকামে অবস্থান করছিলেন। তাই বাইআত করে লোকদের ইসলাহে নফসের প্রতি মনোযোগী হলেন এবং এতে বেশ ফায়দাও হতে লাগল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার মনে হতে লাগল যে, এই কাজ তো আকাবেররা করছেন, অন্য কোনো কাজ করা দরকার। এভাবে তার মনের মধ্যে একটা বেচাইনি, পেরেশানি ও অস্তিরতা বিরাজ করতে লাগল।
এই অস্থিরতার কারণ এই ছিল যে, যেসব ছাত্ররা মাদ্রাসায় ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য আসে তাদের মধ্যে ইলমের একটা পিপাসা থাকে, যারা আত্মশুদ্ধির জন্য খানকায় আসে তাদের মধ্যেও তারবিয়তের একটা আগ্রহ থাকে, কিন্তু যারা নিশ্চিন্তে ঘরে বসে আছে, তাদের মধ্যে কোনো দ্বীনি চেতনা নেই। তাদের কী করে এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা যায়–এই চিন্তায় তিনি অস্থির থাকতেন।
উল্লেখ্য, ইলম হাসিল থেকে ফারেগ হওয়ার পরেই তিনি মনের মধ্যে এই বোঝা অনুভব করছিলেন। তখন তিনি গাংগুহতে স্বীয় মুর্শিদের খেদমতে অবস্থান করছিলেন। যিকির করার সময় নিজের ওপর আজীব ধরনের এক বোঝা অনুভব করতেন। স্বীয় শায়েখের নিকট তিনি নিজের এই অবস্থা তুলে ধরলে হযরত গাংগুহী (রহ.) কেঁপে উঠলেন। তিনি বললেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবীও ঠিক এ ধরনের অভিযোগ স্বীয় মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কীর নিকট পেশ করলে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার দ্বারা বড় কোনো কাজ নেবেন।
১৩৪৪ হিজরীতে তিনি হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর সাথে যখন দ্বিতীয়বার হজ করার জন্য হারামাইন শরীফে হাজির হলেন তখন মদীনা মুনাওয়ারায় স্বপ্নে তাকে জানানো হলো যে, তোমার দ্বারা কাজ নেয়া হবে। এই স্বপ্ন দেখে তিনি কিছুদিন খুব পেরেশান থাকলেন যে, আমি তো কোনো কিছুর উপযুক্ত না। আমি কিভাবে কী করব। জনৈক বুযুর্গের নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, এতে পেরেশান হওয়ার কী
আছে? এটা তো বলা হয়নি যে, তোমাকে কাজ করতে হবে। বরং বলা হয়েছে, তোমার দ্বারা কাজ নেয়া হবে। তো যিনি কাজ নেওয়ার তিনি কাজ করিয়ে নেবেন। এই ব্যাখ্যায় তিনি কিছুটা স্বস্তি লাভ করলেন। কিন্তু
পূর্বেকার সেই অস্থিরতা বেড়ে গেল যে, কাজের ধরনটা কী হবে। হজ থেকে ফেরার পরে দিল্লিতে তার ভাইয়ের ইন্তেকালের কারণে সেখানকার লোকেরা এসে তাকে দিল্লিতে গিয়ে মারকাযের কাজ সামলে নেয়ার জন্য চাপাচাপি শুরু করলে তিনি স্বীয় শায়েখের অনুমতিক্রমে নিযামুদ্দীনে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।
তার পিতা ও ভাই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। আশপাশের লোকেরা আত্মশুদ্ধির জন্য যাতায়াত করতে লাগল। বিশেষ করে মেওয়াতের কিছু লোকের যাতায়াত ছিল। তিনি এই সুবাদে যখন ২-৩ বার মেওয়াত সফর করলেন, তখন দেখলেন সেখানকার লোকেরা নামেই মুসলমান রয়ে গেছে কিন্তু কর্ম, রসম-রেওয়াজ, বিবাহ শাদি সব কিছু হিন্দুদের রীতিনীতি অনুযায়ী হয়। এই পরিস্থিতি দেখেই তার মাথায় বর্তমান পদ্ধতিতে কাজ করার চিন্তা আল্লাহ তা'আলা ঢেলে দিলেন। তিনি মেওয়াতে মক্তব-মাদরাসা স্থাপন করলেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্বীনের তাবলীগ শুরু করে দিলেন। ১৯২৬

সালে মেওয়াতের ফিরোজপুর এলাকা থেকে তাবলীগের এই কাজের সূচনা হল। সে সময়েই তিনি তাবলীগের নিয়মনীতি, রাহবার, আমীর, মুতাকাল্লিম ইত্যাদি বিষয়ের মূলনীতি তৈরি করলেন। ফিরোজপুরে স্থানীয়ভাবে যে কাজ শুরু হয়েছিল, হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) সেটাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করলেন। এই ফিরোজপুর থেকেই সর্বপ্রথম জামাআত বের হলো। যাতে হাফেয মুহাম্মদ ইসহাক, নম্বরদার মেহরাব খান এবং চৌধুরী নামায খান এই তিনজন সদস্য ছিলেন।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর অন্তরে মুসলিম উম্মাহের জন্য ব্যথা

যেকোনো কাজে সফলতার জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতির সাথে সাথে কর্মকর্তাদের ইখলাসের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মধ্যে এটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। যারা হযরত মাওলানাকে দেখেছেন তারা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তিনি সব সময় এতই অস্থির ও পেরেশান থাকতেন যে, মনে হতো তিনি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ নন বরং দুঃখ-বেদনায় গড়া একটা কঙ্কাল।

মাওলানার এক পুরাতন বন্ধু একবার নিযামুদ্দীনে গেলেন। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর তখন ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তিনি অন্দর মহলে হযরত মাওলানার স্ত্রীর নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, মাওলানার বিশেষ কোনো ঘটনা যদি আপনার স্বরণ থাকে তাহলে বলুন। মাওলানার সহধর্মিণী ভেতর থেকে বলে পাঠালেন যে, যখন আমার বিবাহ হয়েছিল এবং রুখছতি হয়ে স্বামীর ঘরে এসেছিলাম তখন আমি দেখলাম রাতে তিনি খুব কমই ঘুমান। বেশির ভাগ সময় তার কান্নাকাটিতে আর অস্থিরভাবে বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতে করতে কেটে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার! রাতে আপনার ঘুমই আসে না? তিনি একটা ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, কী বলব, আমার সেই কষ্টের কথা বললে তখন আর রাত্রি জাগরণকারী একজন থাকবে না, দুজন হয়ে যাবে।

হযরত মাওলানার সারা জীবনের ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি উম্মতের ফিকিরে সর্বক্ষণ ডুবে থাকতেন। মুখে কিছুটা জড়তা থাকার কারণে এবং পুরাতন উর্দু ভাষা ব্যবহারের কারণে অনেক সময় লোকদেরকে মনের কথাটা যদিও স্পষ্টভাবে বোঝাতে সক্ষম হতেন না কিন্তু তার আবেগ-উদ্বেগ আর দরদের কারণে তার অঙ্গভঙ্গির দ্বারাই মর্মটা অনুভব করা যেত। পানিছাড়া মাছের মতো তিনি ছটফট করতে থাকতেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বলতেন, ইয়া আল্লাহ! আমি কী করব। আমার দ্বারা তো কিছু হচ্ছে না। এতই দুর্বল ও রোগাক্রান্ত ছিলেন যে, দর্শকদের মনে দয়ার উদ্রেক হতো। এতদসত্ত্বেও তিনি সুস্থ-সবল মানুষদের তুলনায় বেশি কাজ করতেন। তিনি বলতেন, দ্বীন প্রসারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার জযবা পয়দা করা আমাদের এই তাহরীকের সারসংক্ষেপ।

স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি খানাপিনার কথাও ভুলে যেতেন। মেওয়াতের দুর্গম এলাকায় ২০-২৫ মাইল পর্যন্ত পথ পায়দল সফর করতেন। খানাপিনা সাথে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় ব্যস্ততার কারণে খাওয়ার সুযোগ হতো না। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, শুক্রবারে খানা খেয়ে নিযামুদ্দীন থেকে রওনা হয়েছেন আর রবিবারে নিযামুদ্দীনে ফিরে এসে আবার খানা খেয়েছেন।

রাতের পর রাত জাগ্রত থাকা, পাহাড়ি পথ অতিক্রম করা, মেওয়াতের মরু এলাকায় কখনো গরম বাতাসের ঝাপটা আর শীতের তীব্রতা দুই পায়ে দলে সামনে এগিয়ে যাওয়াই ছিল তার জীবন। এ ধরনের কঠিন সফরের সময় যখন দেখতেন সাথিরা ঘাবড়ে যাচ্ছে, তখন বলতেন, মুজাহাদার পাহাড় অতিক্রম করলেই খোদাকে পাওয়া যাবে। যার মন চায় পরীক্ষা করে দেখো। অসুস্থতার সময় কেউ স্বাস্থ্যের খবর নিতে এলে বলতেন, ভাই! সুস্থতা-অসুস্থতা তো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করার কী আছে। ভালোর প্রশ্ন তো তখন হবে, যখন দেখা যাবে, যে কাজের জন্য আমাদের পয়দা করা হয়েছে, তাতে আমরা সফলকাম হতে পেরেছি।

একবার হযরত মাওলানার পৈতৃক নিবাস কান্ধালা থেকে কিছু আত্মীয়স্বজন শুশ্রূষার জন্য এলে হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, কী জন্য এসেছেন? তারা বলল, আপনার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। মাওলানা বললেন, যে ব্যক্তি নিঃশেষ হওয়ার জন্য দুনিয়াতে আগমন করেছে, তার খবর নেয়ার জন্য এতদূর সফর করতে পেরেছেন আর রাসূলুল্লাহর আনীত দ্বীন, যা নিঃশেষ হবে না, সেটাই যখন মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তখন তার খবর পর্যন্ত নিতে পারছেন না!!

অসুস্থ অবস্থায় ডাক্তারের কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলতেন, তাবলীগের জন্য বলতে বলতে মৃত্যুবরণ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়, চুপ থেকে সুস্থতা হাসিল করার তুলনায়। জনৈক ব্যক্তি "কেমন আছেন" জানতে চেয়ে চিঠি লিখলে উত্তরে তিনি লিখে পাঠালেন, তাবলীগি দুঃখ-বেদনা ছাড়া আর কোনো কষ্ট আমার নেই।

মেওয়াতের মুসলমানদের মুসলমান বানিয়ে দিলেন

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর তাবলীগি মিশনের সফলতা সম্পর্কে আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) লেখেন-

হযরত মাওলানা অত্যন্ত মৌনতার সাথে শুধুমাত্র নিজের ইখলাস এবং সাদাসিদা

তরীকায় দাওয়াতের সঠিক উসূল প্রণয়নের মাধ্যমে পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এসব মেওয়াতীকে খাঁটি মুসলমানে পরিণত করেছেন। যাদের ভেতর-বাহিরের অবস্থায় খানদানি মুসলমানরাও ঈর্ষান্বিত হয়।

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এই কথাটিকে আরেকটু বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেন, মেওয়াতে দ্বীনদারীর এমন সব নমুনা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে, সেসবের মধ্যে যদি কোনো একটার জন্য ইতিপূর্বে বছরের পর বছর মেহনত করা হতো তাহলে সফলতা পাওয়া দুষ্কর হতো। সেখানে এখন দ্বীনের প্রতি উৎসাহ পয়দা হয়েছে। চারদিকে তার আলামত দেখা যাচ্ছে। যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনো মসজিদ নজরে পড়ত না, সেখানে এখন গ্রামে গ্রামে মসজিদ। শত শত মক্তব আর আরবী মাদরাসা কায়েম হয়েছে। হাফেজদের সংখ্যা সহস্র পার হয়ে গেছে। উলামায়ে কেরামের বহুত বড় এক দল তৈরি হয়ে গেছে। হিন্দুয়ানি প্রথাকে মানুষ এখন ঘৃণা করে। সকলের শরীরে ইসলামী লেবাস শোভা পায়। হাতের কড়া আর কানের দুল, যা পুরুষদের শরীরে দেখা যেত, তা এখন বিলুপ্তপ্রায়। নিজ থেকেই সকলে দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। বিবাহ শাদির ক্ষেত্রে সামাজিক কুপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে সুন্নতী তরীকায় তা সম্পাদন হচ্ছে। সুদপ্রথা বিলুপ্ত হচ্ছে। শরাবের প্রতি ঘৃণা জন্ম নিয়েছে। খুন-জখম, হত্যা-লুণ্ঠন একেবারেই কমে এসেছে। বদদ্বীনি, বিদআত, রুসূম আর অশ্লীলতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

জনৈক বৃদ্ধের হাতে ১৮ হাজার মানুষের তাওবা

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) একবার জনৈক বৃদ্ধকে বললেন, বাবা! চার মাস সময় লাগান। সে বলল, চার মাস সময় কী লাগাব। আমি তো কালেমাই পড়তে জানি না। হযরত মাওলানা তাকে বললেন, তুমি গ্রামে গ্রামে যাও আর একথা বলো যে, ভায়েরা আমার! আমার বয়স সত্তর বছর হয়ে গেছে অথচ আমি এখনো কালেমা শিখতে পারি নাই। তোমরা এই ভুলটা করো না। সে এর ওপরই আমল শুরু করল এবং তার এই কথা এতটাই মানুষকে নাড়া দিল যে, ১৮ হাজার মানুষ তার হাতে তাওবা করে পাক্কা নামাজি হয়ে গেল।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) একবার এক মাদরাসায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে এক মেওয়াতীকে তাবলীগের দাওয়াত দেয়া শুরু করলে সে রেগে গিয়ে মাওলানার মুখে এক ঘুসি বসিয়ে দিল। মাওলানা ছিলেন জীর্ণশীর্ণ। বরদাশত করতে না পেরে মাটিতে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর দম নিয়ে আবার বৃদ্ধকে ধরলেন এবং বললেন, আচ্ছা তুমি তো তোমার কাজ করেছো, এবার আমার কথা শোনো। এই অবস্থা দেখে সে লজ্জায় একেবারে চুপসে গেল। মাওলানার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে লাগল, মৌলভী সাহেব আমাকে মাফ করে দাও, নতুবা আমার ক্ষমা হবে না।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর ফিকির দেখে সাহাবাদের কথা মনে পড়ত

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী মক্তব নাজেরা শেষ করার পরে অল্প বয়সেই কুরআনে কারীম হিফয করে ফেলেছিলেন। শৈশব থেকেই তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত চিন্তাশীলদের মতো। তার নানি প্রায় বলতেন, আখতার! তোমার থেকে আমি সাহাবাদের খোশবু অনুভব করি। কী ব্যাপার! তোমার সামনে সাহাবায়ে কেরামের মতো লোকদের চলাফেরা করতে দেখি!

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) তাকে দেখলে বলতেন, আমি যখন মৌলভী ইলিয়াসকে দেখি, তখন আমার সাহাবায়ে কেরামের কথা মনে পড়ে।

শৈশব থেকেই তার মনে দ্বীনের ওপর আমল করা এবং অন্যকে আমল করানোর জযবা ছিল প্রচণ্ড। শৈশবে একদিন তিনি তার মক্তবের সহপাঠী রিয়াজুল ইসলামকে বললেন, চলো মিঞা রিয়াজুল ইসলাম, আমরা বেনামাজিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি।

মার খাওয়ার সুন্নত যিন্দা করলেন

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) যখন তাবলীগের কাজ শুরু করলেন তখন অনেক মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেছে। একবার তিনি গাশতে গিয়ে কয়েকজন নেতা গোছের লোককে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলে তারা এটা বরদাশত করতে পারল না যে, মোল্লা-মৌলভী গোছের লোকেরা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে। তাই তারা মাওলানাকে মারধর করতে শুরু করল। মাওলানা ছিলেন দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী। মারের চোট সহ্য করতে না পেরে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হুঁশ আসার পরে আবার দাওয়াত দেওয়া শুরু করলে তারা আবার প্রহার শুরু করল। কিন্তু পরিশেষে তাদের মনে চিন্তার উদ্রেক হলো যে, এই মৌলভী খামোখা মার খাচ্ছে কেন? কী বলতে চায় সে শুনে দেখি।

তাবলীগের জন্য তিনি পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করতেন। প্রখর রোদ আর প্রচণ্ড লু হাওয়ার মধ্যে সফর করতে থাকতেন। মে-জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে মেওয়াতে সফর করতেন। তীব্র শীতের মধ্যে শহরের পর শহর চষে বেড়াতেন। বলতেন, পরিশ্রমের পাহাড় ডিঙালেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে। যার মনে চায় সাক্ষাৎ করতে পারো। পরিশ্রম করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়, কিন্তু বর্তমানে মানুষ দুনিয়ার জন্য তো দিনরাত মেহনত করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, যা কি না ক্ষণস্থায়ী। অথচ দ্বীনের জন্য কোনো মেহনত করতে রাজি নয়, যা কি না চিরস্থায়ী এবং সফলতার চাবিকাঠি।

লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবিস্মরণীয় কীর্তি

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির চর্চারও গোড়াপত্তন হয়। উপমহাদেশের প্রায় অধিকাংশ শাসকই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত এবং মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইতিহাস থেকে এ কথা দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয় যে, উপমহাদেশের অধিকাংশ শাসক হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করতেন এবং এর ওপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানও হানাফী মাযহাবের অনুসারী। পুরো ইসলামী ইতিহাসে মাযহাবের অস্বীকার এবং পূর্ববর্তী আকাবের-আসলাফের বিষোদগারের খুব একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাওয়া যায় না। কিন্তু মোগল আমলের শেষ দিকে যখন উপমহাদেশে ইংরেজদের অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন নতুন-নতুন অনেক দল সৃষ্টি হয়। লা-মাযহাবী ফিতনাও সে অন্ধকার যুগে সৃষ্টি হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) (১১১৪-১১৭৬) এবং তাঁর সাচ্চা অনুসারীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় পুরো ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.) (শাহাদাত ১২৪৬ হি.) এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) (শাহাদত ১২৪৬ হি.) একদিকে যেমন ছিলেন রণাঙ্গনের দক্ষ ও সাহসী শাহসাওয়ার, তেমনি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেসব শিরকী আকীদা এবং ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সেগুলোর বিরুদ্ধেও ছিল তাঁদের কঠোর অবস্থান। ১২৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৩১ ঈসায়ীতে সংঘটিত বালাকোটের হৃদয়বিদারক ঘটনার পর শুরু হয় ইসলামের বিরুদ্ধে আরেক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র। লা-মাযহাবী নামে পূর্ববর্তী ফুকাহাদের অনুসরণকে কিছু লোক অস্বীকার করে বসে। বিশেষ করে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) (৮০-১৫০)-এর নাম শুনলে তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। ওই দলের পুরোধা ছিলেন মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী (মৃত ১২৭৫ হি.)। তারা হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর খেলাফতের ছদ্মাবরণে সাধারণ লোকদেরকে লা-মাযহাবিয়্যাত (পূর্ববর্তী উলামাদের অনুসরণকে অস্বীকার করা)-এর প্রতি আহ্বান করতে আরম্ভ করে। সে হজের সফরে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর সঙ্গী ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী উলামাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাকে ওই কাফেলা থেকে বের করে দেওয়া হয়। মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী অজস্র সাধারণ মুসলমানকে আমল বিল হাদীস (তথা হাদীসের অনুসরণ)-এর মুখরোচক স্লোগানের মাধ্যমে মাযহাবের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন করে দিয়েছে।

মৌলভী আব্দুল হক বেনারসীর উদ্দেশ্য ছিল, আমল বিল হাদীসের ছদ্মাবরণে মুসলমানদের সাহাবায়ে কেরাম (রা.), সলফে সালেহীন এবং ফুকাহায়ে কিরাম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার মাধ্যমে তাদের মাঝে অনৈক্য এবং বিভেদের বীজ বপন করা। যা তার নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। "আমি আমল বিল হাদীসের মোড়কে ওই কাজটি সম্পাদন করেছি, যা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাও করতে পারেনি।" (দেখুন কারী আব্দুর রহমান পানিপথি (রহ.) কর্তৃক প্রণীত কাশফুল হিজাব, পৃ. ২১)

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সেই ষড়যন্ত্রের জালে মাওলানা নজির হোসাইন দেহলভী (মৃত ১৩২০ হি.), নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃত ১৩০৭) এবং মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন বাটালভীর মতো লোকেরাও ফেঁসে যায়। তাদের হীন প্রচেষ্টায় মাযহাব অস্বীকার করার এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র নতুন রূপ লাভ করে। লা-মাযহাবী আলেমরা ইংরেজদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তাদের শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ইংরেজরা তাদেরকে ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন হিসেবে বিবেচনা করত। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের যে সর্বসম্মত ফতওয়া সত্যপন্থী আলেমরা দিয়েছিলেন, তাতে দস্তখত করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এমনকি জিহাদের বিধান রহিত হয়ে গেছে বলে তারা বিভিন্ন বই-পুস্তকও রচনা করে। ইংরেজরা তাদের গোলামী এবং দালালিতে যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন উপঢৌকন এবং হাদিয়া দেয়। এমনকি এই দলকে ইংরেজরাই সর্বপ্রথম মুহাম্মদী উপাধিতে ভূষিত করে। 'আহলে হাদীস' এই চিত্তাকর্ষক নতুন নামটিও ইংরেজরাই সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম প্রচার করে। বর্তমানে তারা নিজেদেরকে খুব গর্বের সাথে 'আহলে হাদীস' পরিচয় দিয়ে থাকে। (বিস্তারিত জানতে হলে, দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রাশেদ আজমী কর্তৃক প্রণীত মোহাযারায়ে রদ্দে গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাত গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে)

তাদের প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের প্রতিক্রিয়া :

১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের পর দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেওবন্দের বীর সেনানীরা নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়ায় একদিকে ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কৃষ্টি-কালচারের সংরক্ষক, অন্যদিকে ছিলেন ইংরেজ শাসনের ঘোরবিরোধী। 'দারুল উলূম দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যেসব অভ্যন্তরীণ ফিতনার সম্মুখীন হয়েছে তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ফিতনা হচ্ছে, লা-মাযহাবী ফিতনা। হযরত শাহ ইসহাক দেহলভী (রহ.) (মৃত ১২৬২ হি.) যখন মদীনা শরীফ হিজরত করেন, মিয়া নজীর হোসাইন দেহলভী নামে এক আলেম হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে বিষোদগার আরম্ভ করে এবং হানাফীদেরকে বিতর্কের জন্য আহ্বান করে। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) (১৫০-২০২ হি.)-এর মতাদর্শ অনুসরণ করতেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ইমামের অনুসরণকে তিনি অস্বীকার করতেন। তার কিছু ছাত্র ছিল, যারা সারা দেশে তার মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার-প্রসার করত। যেসব অঞ্চলে তার ছাত্ররা ছিল, সেসব অঞ্চলে তার মতাদর্শ দ্রুতগতিতে প্রচার-প্রসার লাভ করে। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সে ততটুকু সফলতা পায়নি। যেহেতু মৌলভী নজীর হোসাইনের হেডকোয়ার্টার ছিল দিল্লি, তাই দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তার কর্মতৎপরতার সংবাদ পৌঁছতে থাকে। লা-মাযহাবীরা কোনো ইমামের অনুসরণকে পথভ্রষ্টতা এবং গোমরাহী হিসেবে আখ্যায়িত করত এবং ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত কঠোর ও মারমুখী আচরণ করত।

এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচি হাতে নেন বীর মুজাহিদ উলামায়ে কেরাম। শুরু হয় লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধ মিশন।

হাদীস পাঠদানে নতুন পদ্ধতি :

উলামায়ে দেওবন্দ হাদীস পাঠদানের ক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। যাতে আলেমদের এমন একটি দল সৃষ্টি হয়, যাদের কুরআন-হাদীস এবং ইসলামী আইন শাস্ত্রের ওপর থাকবে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা। হিজরী তের শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হাদীস পাঠদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হাদীসের সরল অনুবাদ এবং চার মাযহাব বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদীসরা যখন জোরেশোরে হানাফী মাযহাবের ওপর এই অপবাদ লাগানো আরম্ভ করে যে, হানাফী মাযহাবের অবস্থান হাদীসের বিরুদ্ধে, তখন হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (রহ.) এবং তাঁর কিছু ছাত্র হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাকে অন্যান্য মাযহাবের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসেম নানুতভী (রহ.) (১২৪৮-১২৯৭), ফকীহুন নাফস আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) (মৃ ১৩২৩ হি.), শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান (রহ.) (মৃত ১৩৩৯)সহ অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করে এসেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রায় সব প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে হাদীস পাঠদানের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবকে অন্যান্য মাযহাবের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার যে ধারা, হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি, যাকে দারুল উলূমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত করা হচ্ছে, তা তথাকথিত আহলে হাদীসের ফিতনা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই সূচনা করা হয়েছিল।

পাশাপাশি উলামায়ে দেওবন্দ হাদীসের বিশাল-বিশাল গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধারা আরম্ভ করেন। সেখানে তাঁরা হানাফী মাযহাবকে হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন এবং বাহ্যিকভাবে যেসব হাদীস হানাফী মাযহাবের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, সেগুলোরও বিস্তারিত উত্তর উপস্থাপন করেছেন। হাদীসের ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের জন্য আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) (১৩২৩) কর্তৃক প্রণীত লামিউদ দারারী (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ), আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) (মৃত ১৩৫২ হি.) কর্তৃক প্রণীত ফয়যুল বারী (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ), আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত ফাতহুল মুলহিম (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ), আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) (১২৬৯-১৩৪৬ হি.) কর্তৃক প্রণীত বজলুল মজহুদ (আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ), শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.) (মৃত ১৪০২ হি.) কর্তৃক প্রণীত আওজাযুল মাসালেক (মুয়াত্তা মালিকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ), মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী (রহ.) (১৩৩৫-১৩৮৪) কর্তৃক প্রণীত আমানিল আহবার (ত্বাহাবী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ), হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল কওকবুদ দুররী, আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.) (মৃত ১৩৯৭ হি.) কর্তৃক প্রণীত মাআরিফুস সুনান (তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ) এবং আরো অন্যান্য গ্রন্থ দেখা যেতে পারে। হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। এ ক্ষেত্রে যে গ্রন্থটির কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তা হচ্ছে

এ'লাউস সুনান, যা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) (১২৮০-১৩৬২)-এর তত্ত্বাবধানে হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহ.) (মৃত ১৩৯৪) রচনা করেন। ১৮ খণ্ডে প্রকাশিত এই বিশাল গ্রন্থটির মাধ্যমে গ্রন্থকার হানাফী মাযহাবের প্রায় সব মাসাআলাকে হাদীস দিয়ে প্রমাণ করার অবিস্মরণীয় কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন।

মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখালেখি :

পুরো দেশে লা-মাযহাবীদের সংখ্যা যদিও নিতান্তই স্বল্প; কিন্তু তাদের স্বভাবজাত বেয়াদবী, গোঁড়ামি, চরমপন্থা এবং অনুল্লেখ্য বিষয়েও তাদের বাড়াবাড়ির কারণে অনেক সময় জনসাধারণ বিভ্রান্তির শিকার হয়। তাই লা-মাযহাবীদের মুখোশ এবং তাদের স্বরূপ উন্মোচন করার নিমিত্তে হকের বীর সেনানী উলামায়ে দেওবন্দ সে দিকে মনোযোগী হন। হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) ইমামের পেছনে কেরাত পড়া, উচ্চস্বরে আমীন বলা, রফয়ে ইয়াদাইন, তারাবীহসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করেন। যদিও নানুতবী (রহ.) তখন খ্রিস্টবাদ এবং সনাতন ধর্মের অসারতা প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন।

এভাবে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)ও তাকলীদ, তারাবীহ, ইমামের পেছনে কেরাত, উচ্চস্বরে আমীন বলা, গ্রামে জুমু'আ আদায়সহ অন্যান্য বিষয়ে গবেষণালব্ধ বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেন।

গাইরে মুকাল্লিদরা জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন নতুন পন্থা অবলম্বন করে। তারা বিভিন্ন মাসায়েলকে লিফলেট আকারে প্রচার করে। উদ্দেশ্য, বিভ্রান্তি ছড়ানো ও নিজেদের খ্যাতি অর্জন। হক্বপন্থী আলেমগণ অনেকটা বাধ্য হয়ে তাদের এই অযাচিত কর্মকাণ্ডের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া আরম্ভ করেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইনের এ ধরনের একটি লিফলেটের উত্তরে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) (মৃত ১৩৩৯ হি.) রচনা করেন আদিল্লায়ে কামেলা এবং তাদের উত্থাপিত দশটি প্রশ্নের দাঁতভাঙা জবাব দেন। মৌলভী হোসাইনের পক্ষ থেকে তার কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। বরং তার এক সাথী মৌলভী আহমদ হাসান আমরোহী তার উত্তর লেখার চেষ্টা করে। মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইনও তাকেই যথেষ্ট মনে করে। এরপর হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) তার প্রত্যুত্তরে ইযাহুল আদিল্লাহ রচনা করেন। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় চারশত। এই গ্রন্থটি হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর অসামান্য মেধা ও বর্ণনাতীত প্রতিভার পরিচায়ক। মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে এই কিতাবকে পার্থক্য নিরূপক সাব্যস্ত করা হয়।

সালাফিয়্যাতের ছদ্মাবরণে লা-মাযহাবী ফিতনা :

উপমহাদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কর্মপন্থা এবং আযাদী আন্দোলনের কারণে লা-মাযহাবী ফিতনা তার জোর হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা ইংরেজদের বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ফলে বেশ কিছুদিন এই ফিতনা আর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। কিন্তু আরব বিশ্ব, বিশেষ করে সৌদি আরব যখন তেলের কারণে সমৃদ্ধি অর্জন করে, তখন এই ফিতনা আবার জোরেশোরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আরবের সালাফী এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে একীভূত হয়ে লা-মাযহাবীরা আরবদের সালাফিয়্যাতের ছদ্মাবরণে নিজেদের অবস্থান ও প্রভাব বিস্তার করা আরম্ভ করে এবং ষড়যন্ত্রের ডালপালা বিস্তার করে। তারা খারেজীদের পন্থা অবলম্বন করত পূর্ববর্তী বুজুর্গদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে সত্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা আরম্ভ করে। আর যারা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় তাদেরকে ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট বরং অমুসলিম সাব্যস্ত করতে তারা সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে তারা উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেছে। স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এর পেছনে কাজ করছে। প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই-পুস্তক তো আছেই। শুধু উলামায়ে দেওবন্দের কুৎসা, অপবাদ-অপপ্রচারের বিরাট দাস্তান নিয়ে স্বতন্ত্র বই-পুস্তকও রচনা করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। তারা উলামায়ে দেওবন্দকে যে শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না, তা নয় বরং ইসলামের গণ্ডি থেকে তাদের বের করে দিতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

লা-মাযহাবীদের এই পীড়াদায়ক ও ভয়ানক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আবার গর্জে ওঠে উলামায়ে দেওবন্দ। যেসব বিষয়কে লা-মাযহাবীরা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপক সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো স্বরূপ আসলে কী? মতবিরোধের কতটুকু সীমায় অবস্থান করলে রহমতের ভাগীদার হওয়া যায়, আর কতটুকু অতিক্রম করলে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়? এ ক্ষেত্রে মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.), মাওলানা সরফরাজ খান সফদর (রহ.), মাওলানা আবু বকর গাজীপুরী (রহ.)সহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন এবং চিরতরে এই ফিতনার দরজাকে রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

লা-মাযহাবী ফিতনার প্রতিরোধ এবং সৌদি সরকার কর্তৃক তাদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিবাদে ২০০১ সালের ২ এবং ৩ মে দিল্লিতে ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা আস'আদ মাদানী (রহ.) (১৩৪৬-১৪২৭ হি.)-এর

তত্ত্বাবধানে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ আয়োজন করে 'তাহাফফুজে সুন্নাত কনফারেন্স'। যাতে এই ফিতনার মূলোৎপাটনের সাথে সাথে সৌদি সরকারকে তাদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর সতর্ক করা হয়। এভাবে ২০১৩ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি দারুল উলূম দেওবন্দের আহবানে অনুষ্ঠিত হয় আলেম-উলামাদের বিশেষ কনফারেন্স। ওই কনফারেন্সে আগত দেশি-বিদেশি আমন্ত্রিত অতিথিদের লা-মাযহাবী ফিতনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতিরোধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এভাবে শহরাঞ্চল থেকে মফস্বল, দেশের আনাচে-কানাচে তাহাফফুজে সুন্নাত কনফারেন্স এবং সেমিনারের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী বীর মুজাহিদ উলামায়ে দেওবন্দ লা-মাযহাবীদের অসৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছেন। মাযহাব অস্বীকারের ছদ্মাবরণে ধর্মহীনতার মূলোৎপাটনে উলামায়ে দেওবন্দ অপরিসীম আত্মত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন। লা-মাযহাবী ফিতনার বিরুদ্ধে তাদের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতার ইতিহাস অতি দীর্ঘ ও বিস্তৃত। উপমহাদেশের মাটিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা লা-মাযহাবী ফিতনার মোকাবিলায় উলামায়ে দেওবন্দ নিবেদিত না হলে ইসলামের আলো এই অঞ্চল থেকে হয়তো চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যেত অথবা ইসলাম তার স্বকীয় রূপ হারিয়ে নতুন কোনো ভ্রান্ত রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছত। আর গোটা মুসলিম উম্মাহকে দিতে হতো এর চরম খেসারত। তাই লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে তাদের অবিস্মরণীয় কীর্তি মুসলিম উম্মাহ চিরকাল হৃদয়ে গেঁথে রাখবে। আর তা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

ইলমে ফিকহ এবং ফুকাহাদের সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান :

উলামায়ে দেওবন্দ শরীয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসারী। বরং এক জরিপে দেখা যায় যে, ভারত উপমহাদেশে বসবাসরত আনুমানিক ৫০ কোটি মুসলমানের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগের অধিক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শেরই অনুসারী। কিন্তু তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে অন্য মাযহাবকে ভ্রান্ত এবং অন্যান্য ইমামদেরকে নিয়ে কুৎসা রটানোকে বৈধ মনে করে না।

হানাফীদের কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আলাউদ্দীন আল আসকাফী (রহ.) লিখেন, আমাদের (হানাফীদের) মাযহাব সঠিক, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনাও রয়েছে। আর আমাদের বিপরীত মাযহাবগুলো (মনে করি) ভুল-ত্রুটিপূর্ণ তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

(আদ্দুররুল মুখতার ১/৪৮ সাঈদ কোম্পানী, রাদ্দুল মুহতারসহ)

তবে হ্যাঁ যেকোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাব এবং নির্দিষ্ট ইমামেরই অনুসরণ করতে হবে। এর ওপরই উম্মাহর ইজমা বা ঐক্য সংঘটিত হয়েছে। কেননা স্বার্থান্ধ বা কুপ্রবৃত্তিতাড়িত মানুষকে যদি একাধিক মাযহাবের তাকলীদ বা অনুসরণের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে সে ছিদ্র পথে বুঝে কিংবা না বুঝে অথবা বোঝার অজুহাত ধরে জড়িয়ে পড়বে নফসের গোলামীতে। আর বয়ে আনবে স্বাধীনতার নামে দ্বীন-দুনিয়ার ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক পরিণতি। তাকলীদের ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দ উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ওপরই অবিচল রয়েছে। তারা হানাফী মাযহাবের পাক্কা অনুসারী। কিন্তু অন্য ইমামদের প্রতিও রয়েছে তাদের অগাধ ভক্তি ও অপরিসীম শ্রদ্ধা।

দারুল উলূম দেওবন্দে যেভাবে তাখাসসুস ফি উলূমিল হাদীসের সূচনা :

২০০০ সালের দিকের ঘটনা। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে যোগ দিতে তাশরীফ আনেন দারুল উলূম দেওবন্দের তৎকালীন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী (রহ.)। ওই বছর নোয়াখালী মাইজদীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে তিনি তাশরীফ নিয়ে যান। সম্মেলন শেষে এ দেশের শীর্ষ মুরব্বি হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব হযরত ফেদায়ে মিল্লাতকে বলেন, হযরত! জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদীতে আমি মাঝেমধ্যে ঢাকা থেকে এসে বুখারী শরীফের দরস দিই। আজ এখানে খতমে বুখারী অনুষ্ঠিত হবে। আমরা চাচ্ছি, আপনার মাধ্যমে এই মোবারক কাজটি সম্পন্ন করতে। ফেদায়ে মিল্লাত (রহ.) এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু ফেদায়ে মিল্লাত (রহ.) হযরতওয়ালাকে বললেন, বুখারী খতম আপনি করুন। আমি দু'আ করে দেব। হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দা.বা.) বুখারী খতমের আলোচনা করতে গিয়ে নিজের সনদ বর্ণনা করলেন। তাতে তিনি হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নাম ফেলে দিয়ে এভাবে বললেন, আমি হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর কাছে পড়েছি, তিনি পড়েছেন হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে, তিনি পড়েছেন হযরত শাহ আব্দুল গণী (রহ.)-এর কাছে। মাঝখানে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করলেন না। যা হোক, অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তাঁরা যখন গাড়িতে করে চট্টগ্রামের

উদ্দেশে রওনা হলেন, তখন হযরত ফেদায়ে মিল্লাত (রহ.) হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দা. বা.)-কে বললেন, সনদ বর্ণনায় মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নাম বাদ পড়ল কেন? উত্তরে হযরতওয়ালা বললেন আমি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়েছি। কারণ, অনেক দিন ধরে আমার অন্তরে একটি কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমি ভাবলাম, সনদে আমি যদি একটি নাম বাদ দিই, তাহলে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। সেই সুযোগে আপনাকে কথাটা বলতে পারব। ফেদায়ে মিল্লাত (রহ.) বললেন, কথাটা কী? তিনি বলেন, হযরত আমাদের উপমহাদেশে হাদীসের সনদ নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না বললেই চলে। এর জন্য কোনো স্বতন্ত্র কোর্সও নেই। সনদের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো বর্ণনাকারী যদি কম হয়, তাহলে ওই সনদকে আলী তথা উচ্চমানের বলে পরিগণিত করা হয়। আর বর্ণনাকারী অধিক হলে ওই সনদ সাফেল তথা নিম্নমানের গণনা করা হয়। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে দুটি সনদ রয়েছে। একটি সনদ হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর মধ্যস্থতায়, অন্যটি কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি শাহ আব্দুল গণী (রহ.)-এর কাছ থেকে। যেহেতু দ্বিতীয় সনদটি উচ্চমানের, তাই আমি ওই সনদটি উল্লেখ করেছি। এছাড়া আমাদের ছাত্ররা যখন আরব রাষ্ট্রে লা-মাযহাবীদের বিরুদ্ধে কোনো হাদীস উপস্থাপন করে, তখন তারা বলে এই হাদীসের সনদ দুর্বল। আমাদের ওই ছাত্রের যেহেতু সনদ নিয়ে তেমন কোনো ধারণা নেই, তাই সে এর কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে তারা বিভ্রান্তিতে পড়ছে। এই সমস্যা নিরসনে আমি বসুন্ধরায় ইতিমধ্যে হাদীসের ওপর উচ্চতর গবেষণা কোর্স আরম্ভ করেছি। কিন্তু এর মাধ্যমে তো পুরো বিশ্বে কোনো জাগরণ সৃষ্টি হবে না। দারুল উলূম দেওবন্দে যদি তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীস খোলা হয় তাহলে আমাদের ছাত্ররা আহলে হাদীসের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পেত। হযরত ফেদায়ে মিল্লাত (রহ.) বললেন, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। দারুল উলূমের পরবর্তী মজলিসে শূরার অধিবেশনে আমি এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করব। এরপর রজবের শেষে দেওবন্দের মজলিসে শূরায় বিষয়টি উত্থাপিত হলে সবাই এর পক্ষে মত দেন। পরে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী শিক্ষাবর্ষের শাওয়াল থেকে এই কোর্সের সূচনা করা হবে। ওই কোর্সের পাঠ্যক্রম থেকে নিয়ে সব কিছু নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হলো দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক বাহরুল উলূম মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ আজমী সাহেবকে। তখন তিনি হযরতওয়ালার কাছে চিঠি লেখে উচ্চতর হাদীস বিভাগের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান। মারকায থেকে তাদের কাছে পাঠ্যক্রম প্রেরণ করা হয়। তারা ওই পাঠ্যক্রম সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে দারুল উলূম দেওবন্দের উচ্চতর হাদীস বিভাগের নেসাব নির্ধারণ করেন। এর এক বছর পর বাহরুল উলূম হযরত মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ সাহেব বসুন্ধরা মারকাযে তাশরীফ নিয়ে আসেন। তাঁর সাথে মারকাযের উস্তাদদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তদপ্রেক্ষিতে দেওবন্দের উচ্চতর হাদীস বিভাগের নেসাবকে সামনে রেখে মারকাযের নেসাবে পরিবর্তন আনা হয়। এর পরের বছর ২০০১ সালে তথাকথিত আহলে হাদীস প্রতিরোধের লক্ষ্যে দিল্লিতে হযরত মাওলানা ফেদায়ে মিল্লাত (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় তাহাফফুজে সুন্নাত কনফারেন্স। সেখানে বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত ছিলেন হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (দা.বা.)। ওই কনফারেন্সের এক অধিবেশনে হযরতওয়ালা সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তাহাফফুজে সুন্নাত কনফারেন্সের এই মোবারক ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার মুম্বাই হজ হাউস বিল্ডিংয়ে অনুষ্ঠিত হলো ইমাম আজম কনফারেন্স।

লেখনীর জগতে তাদের অসামান্য অবদান :

লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ লেখনীর জগতে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা কলমের মাধ্যমে বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। তবুও তাদের কিছু কীর্তির বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

১। তাওছীকুল কালাম ফিল ইনসাতি খলফাল ইমাম। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)।

২। আল হাক্কুস সরীহ। ঐ।

৩। লতায়েফে কাসেমী। ঐ।

৪। সাবীলুর রাশাদ। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)।

৫। হিদায়তুল মু'তাদী ফী কিরাআতুল মুক্তাদী। ঐ।

৬। আররা'য়ুন নাজীহ। ঐ।

৭। আদিল্লায়ে কামেলা। শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান (রহ.)।

৮। ঈজাহুল আদিল্লাহ। ঐ।

৯। আল ইকতিসাদ ফীদ্দাদ। মাওলানা রহীমুল্লাহ বিজনুরী (রহ.)।

১০। আল ইকতিসাদ ফীত তাকলীদি ওয়াল ইজতিহাদ। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)।

১১। ইস্তিজাবুদ দাওয়াত আকীবাস সালাওয়াত। ঐ।

১২। আল কওলুল বদী ফী ইশতিরাতিল মিসরি লিত্তাজমী। ঐ।

১৩। ফসলুল খিতাব ফী মাসআলাতি

উম্মিল কিতাব। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)।
১৪। খাতিমাতুল কিতাব ফী মাসআলাতি ফাতিহাতিল কিতাব। ঐ।
১৫। নাইলুল ফারকাদাইন ফী মাসআলাতি রফইল ইয়াদাইন। ঐ।
১৬। বসতুল ইয়াদাইন লি নাইলিল ফারকাদাইন। ঐ।
১৭। কাশফুস সিতরি আন সালাতিল বিতির। ঐ।
১৮। হিদায়াতুল মুক্তাদীন। মাওলানা সায়্যিদ আসগার হুসাইন দেওবন্দী (রহ.)।
১৯। আল ফুরকান ফী কিরাআতি উম্মিল কুরআন। মাওলানা নাযের দেওবন্দী (রহ.)।
২০। আল জাওয়াবুল কামিল ফী ইজহাকিল বাতিল। ঐ।
২১। খাইরুত্তানকীদ ফী মাসআলাতিত তাকলীদ। মাওলানা খাইর মুহাম্মদ জালন্দরী (রহ.)।
২২। খাইরুল মাসাবীহ ফী আদদিত তারাবীহ। ঐ।
২৩। আল ফতহুল মুবীন ফী কশফিল মাকায়িদী গাইরিল মুকাল্লিদীন। মাওলানা মনসূর আলী মোরাদাবাদী।
২৪। নূরুল আইনাইন ফী তাহকীকি রফইল ইয়াদাইন। মাওলানা ইশফাকুর রহমান কান্দলভী।
২৫। কুরআন ওয়া হাদীস কে খেলাফ গাইরে মাকল্লিদীন কে পচাস মাসায়েল। মুফতী মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী (রহ.)
২৬। কশফুল গুম্মা বি-সিরাজিল উম্মাহ। ঐ।
২৭। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কি সিয়াসী জিন্দেগী। মাওলানা মুনাজির আহসান গীলানী (রহ.)।
২৮। আল আযহারুল মরবু'আ ফী রাদ্দিল আসারিল মাতবূআ। মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.)।
২৯। রাক'আতে তারাবীহ। ঐ।
৩০। আল আলামুল মরফুআ ফী হুকমি তলকাতিল মজমূআ। ঐ।
৩১। তাহকীকে আহলে হাদীস। ঐ।
৩২। আল-আলবানী শুজুজুহু ওয়া আখতাউহু। ঐ।
৩৩। হুজ্জিয়াতে হাদীস। মাওলানা ইদ্রিস কান্দলভী (রহ.)।
৩৪। ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ কি বে-মেছাল তাহকীক। ঐ।
৩৫। হিফজুর রহমান লি মাযহাবিন নূমান। মাওলানা হিফজুর রহমান সিহারভী (রহ.)।
৩৬। ইমাম আবু হানীফা। মুফতী আজীজুর রহমান বিজনূরী (রহ.)।
৩৭। তাকলীদে আইম্মা। মাওলানা ইসমাঈল।
৩৮। কিরাআত খলফাল ইমাম। মাওরানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.)।
৩৯। রফয়ে ইয়াদাইন। ঐ।
৪০। আমীন বিল জেহের। ঐ।
৪১। আলকালামুল মুফীদ ফী এছবাতিত্তাকলীদ। মাওলানা সরফরাজ খান সফদর (রহ.)।
৪২। তাছকীনুস সুদুর ফী তাহকীকি আহওয়ালিল মাওতা ফীল বরযাখি ওয়াল কুবূর। ঐ।
৪৩। আহসানুল কালাম মাসআলায়ে ফাতিহা খলফাল ইমাম। ঐ।
৪৪। তায়েফায়ে মনসূরা। ঐ।
৪৫। উমদাতুল আসাস। ঐ।
৪৬। মকামে আবী হানীফা (রহ.)। ঐ।
৪৭। ইয়ানাবী' (তারাবীহ)। ঐ।
৪৮। গাইরে মুকাল্লিদীন কী ডায়েরি। মাওলানা আবুবকর গাজীপুরী (রহ.)।
৪৯। আরমগানে হক। ঐ।
৫০। ওয়াকফাতুন মা'আল লা-মাযহাবিয়্যা। ঐ।
৫১। সাহাবায়ে কেরামকে বারে মে গাইরে মুকাল্লিদীন কা মাওকিফ। ঐ।
৫২। মাসায়েলে গাইরে মুকাল্লিদীন। ঐ।
৫৩। হাদীস আওর আহলে হাদীস। ঐ।
৫৪। আওরতূঁ কা তরীকায়ে নামায। মুফতী আবুল কাসেম নূমানি (দা. বা.)।
৫৫। ফিকহে হানফী আকরাব ইলান নুসূস হে। মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপূরী (দা. বা.)।
৫৬। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) পর ইরজা কি তুহমত। মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ আজমী (দা. বা.)।
৫৭। ইলমে হাদীস মে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কা মকাম ওয়া রুতবা। মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী।
৫৮। মাসায়েলে নামায। ঐ।
৫৯। ইমাম কে পীচে মুক্তাদী কি কিরাআত কা হুকুম। ঐ।
৬০। তাহকীকে মাসআলায়ে রফয়ে ইয়াদাইন। ঐ।
৬১। খাওয়াতীনে ইসলাম কি বেহতরীন মসজিদ। ঐ।
৬২। তালাকে সালাস। ঐ।
৬৩। শরীয়তে মুতাহ্হারা মে সাহাবায়ে কেরাম কা মকাম আওর গাইরে মুকাল্লিদীন কা মওক্বিফ। মাওলানা আব্দুল খালেক।
৬৪। ইজমা ওয়া কিয়াস কি হুজ্জিয়াত। মুফতী রাশেদ আজমী।
৬৫। মোহাজারাতে রদ্দে গাইরে মুকাল্লেদিয়্যাত। ঐ।
৬৬। গাইরে মাকাল্লিদীন কা আসলী চেহরা। মুফতী আহমদ মমতাজ।
৬৭। আহলে হাদীস আওর ইংরেজ। মাওলানা বশীর আহমদ।
৬৮। ফুতুহাতে সফদর। মাওলানা আমীন সফদর।
৬৯। তজল্লিয়াতে সফদর। ঐ।
৭০। তিরয়াকে আকবর ব-যুবানে সফদর। ঐ।
৭১। কুরআন ও হাদীস আওর মসলকে আহলে হাদীস। পালন হক্কানী

গোজরাতী।

৭২। গাইরে মুকাল্লিদীন ইমাম বোখারী (রহ.) কি আদালত মে। মাওলানা আনওয়ার খোরশেদ।

৭৩। মাসায়েল ওয়া আকায়েদ মে গাইরে মুকাল্লিদীন আওর শীয়া মযহাব কা তাওয়াফুক। মাওলানা জামাল মীরাঠি।

৭৪। তাওসসুল ওয়া ইস্তিগাসা বিগাইরিল্লাহ আওর গাইরে মুকাল্লেদীন। মুফতী মাহমূদ হাসান বুলন্দশহরী।

৭৫। গাইরে মুকাল্লেদীনকে ১৫৬ এ'তেরাজাতা কে জাওয়াবাত। মুফতী শিব্বির আহমদ কাসেমী।

৭৬। ঈজাহুল মাসালেক। ঐ।

৭৭। রাসায়েলে গাইরে মুকাল্লেদিয়্যাত। ঐ।

৭৮। ফজায়েলে আমাল পর ই'তিরাজ, এক উসূলী জায়েযা। মাওলানা আব্দুল্লাহ মারুফী।

৭৯। তাযকিরাতুন নূমান। মাওলানা আব্দুল্লাহ বস্তবী মাদানী।

৮০। তাকলীদ কী শরয়ী হাইসিয়াত। শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তকী উসমানী।

লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে বাংলাদেশে উলামায়ে দেওবন্দের উজ্জ্বল ভূমিকা :

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বর্তমানে ষড়যন্ত্রকারীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। ইসলামের আজন্ম শত্রু ইহুদি-খ্রিস্টানদের শ্যেনদৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে নিবদ্ধ। এই ফিতনা কখনও কাদিয়ানীদের আকৃতিতে, কখনও দেওয়ানবাগ, কখনও আটরশি, কখনও মাজারপন্থী, আবার কখনও অন্যরূপে প্রকাশ পায়। তবে বর্তমানে সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে লা-মাযহাবী ফিতনা। এরা সাধারণ মুসলমানদেরকে পূর্বসূরিদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করার মাধ্যমে দ্বীনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলতে চায়। যার প্রমাণ এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মসজিদে নামাযের মাসআলা নিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এদের ফিতনা বাংলাদেশে ভয়ানক রূপ ধারণ করে। উম্মাহর এমন নাজুক পরিস্থিতিতে হকের দীপ্ত মশাল নিয়ে এই রণাঙ্গনে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলেন উলামায়ে দেওবন্দের এক সাহসী সন্তান, যার বজ্রকণ্ঠ উম্মাহর অশান্ত চিত্তে বারবার শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়, উলামায়ে আহলে হকের মুখপত্র ও অন্যতম শীর্ষ মুরব্বি ফকীহুল মিল্লাত (দা. বা.)। তিনি লা-মাযহাবীদের প্রতিরোধে ১৯৯৫ সালে মারকাযে সর্বপ্রথম সূচনা করেন তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীস তথা উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ। আয়োজন করেন বিভিন্ন সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম। শত বাধা-বিপত্তির পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তিনি জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, এই লা-মাযহাবী ফিতনা হচ্ছে বর্তমানে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা। এই বৃদ্ধ বয়সেও বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত চষে বেড়িয়েছেন। ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা তাকে রুখতে পারেনি, দমাতে পারেনি কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারও। আপন মিশন থেকে কখনও এক পা বিচ্যুত হননি। ২০০০ সালের দিকে তিনি অনুভব করলেন এই আন্দোলনকে আঞ্চলিকতার খোলস ছেড়ে আন্তর্জাতিক পোশাক পরিধান করানো দরকার। তাই একটি আন্তর্জাতিক ফিকহী সেমিনার করার সিদ্ধান্ত হলো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০০১ সালে আয়োজন করা হয় দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ফিকহী সেমিনার। আমন্ত্রণ জানানো হয় ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের প্রথিতযশা উলামায়ে কেরামদের। তন্মধ্যে শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তকী উসমানী, শায়খুল হাদীস দারুল উলূম করাচি, বাহরুল উলূম আল্লামা নিয়ামতুল্লাহ আজমী, প্রধান, উচ্চতর হাদীস বিভাগ দারুল উলূম দেওবন্দ, খতীবে ইসলাম মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনূরী, সাবেক শিক্ষাসচিব এবং বর্তমান শিক্ষক দেওবন্দ এবং গাইরে মুকাল্লিদদের মূর্তিমান আতঙ্ক মাওলানা আবু বকর গাজীপুরী, সম্পাদক দ্বিমাসিক জমজম, ভারত প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিন সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল দেওবন্দিয়্যত কী? এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সর্বশেষে সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেন আল্লামা তকী উসমানী (দা. বা.)। দ্বিতীয় দিনের বিষয়বস্তু ছিল ফিতনায়ে গাইরে মুকাল্লেদিয়াত তথা লা-মাযহাবী ফিতনা। বিষয়ের ওপর আমন্ত্রিত অতিথিরা গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেন এবং তাদের স্বরূপ উম্মতের সামনে উন্মোচিত করেন। উভয় দিন কুরআন-হাদীস এবং পূর্বাভিজ্ঞতার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন ফকীহুল মিল্লাত (দা.বা.)। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশি আলেম-উলামাদের এত ভিড় ছিল, যা ইতিপূর্বে আর কোনো ইলমী-ফিকহী সেমিনারে পরিলক্ষিত হয়নি। এই সেমিনারে আল্লামা তকী উসমানী স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন বর্তমানে মুসলমানদের জন্য লা-মাযহাবীরাই সবচেয়ে বড় ফিতনা।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লা-মাযহাবীদের দৌরাত্ম্য আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ মুসলমান তো আছেই, আলেম-উলামা, মসজিদের ইমাম ও খতীবরা পর্যন্ত তাদের জালে ফেঁসে যাচ্ছেন। তাই

ইমাম-খতীবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলার খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে হযরতওয়ালা দেশের কয়েকটি বিভাগীয় শহরে আয়োজন করেন লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স। উদ্দেশ্য তাদের উদ্ভট, বানোয়াট ও ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রমাণিত করা। আমন্ত্রণ জানানো হয় লা-মাযহাবীদের মূর্তিমান আতঙ্ক, সফল প্রশিক্ষক মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মাসুম সাকিব মুরাদাবাদী সাহেবকে। এই প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর চট্টগ্রামে ২৪ মার্চ সোমবার, জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদী নোয়াখালীতে ২৫ মার্চ মঙ্গলবার এবং ২৬ মার্চ বুধবার জামিল মাদরাসা, বগুড়ায়। ২৭, ২৮ ও ২৯ মার্চ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার তিন দিনব্যাপী মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরায় এই প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রধান প্রশিক্ষক মুফতী মাসুম সাহেবের ভিসা জটিলতার কারণে ঠিক সময়ে বাংলাদেশে পৌঁছতে না পারায় এই কোর্সের সময় আরো দুই দিন তথা ৩০ ও ৩১ মার্চ রবি ও সোমবার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

প্রধান প্রশিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতী মাসুম সাহেব এতে লা-মাযহাবীদের উৎপত্তি, বিকাশ, ভ্রান্ত আকীদা, চরমপন্থা, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তাদের অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের প্রতিরোধের ধরন কেমন হওয়া উচিত, এর ওপর তাত্ত্বিক ও সারগর্ভ আলোচনা করেন। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দামাত বারাকাতুহুম প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে নসীহতমূলক বয়ান রাখেন। এতে গুরুত্বপূর্ণ আরো আলোচনা করেন হযরত মাওলানা মুফতী মনসুরুল হক্ব, মুফতী এনামুল হক কাসেমী সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ হারুন সাহেব, মাওলানা মুফতী রফীকুল ইসলাম আলমাদানী এবং মাওলানা আসগর সাহেব প্রমুখ।

এই সেমিনারে উপস্থিতিদের মাঝে দেখা যায় ব্যাপক আগ্রহ-উদ্দীপনা। দেশ-বিদেশের মুসলমানগণ এই সেমিনার থেকে উপকৃত হওয়ার নিমিত্তে ইন্টারনেটে সরাসরি সম্প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের আশা, মাসিক আল-আবরার এই প্রশিক্ষণ কোর্সের, বিশেষ করে হযরত মুফতী মাসুম সাহেবের বয়ানগুলোর অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবেল।

লা-মাযহাবীদের এই ভয়ংকর ফিতনা মোকাবিলায় বর্তমানে বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম লেখালেখির ময়দানে অবদান রাখছেন। ইতিমধ্যে ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে মাওলানা রফীকুল ইসলাম আলমাদানী কর্তৃক প্রণীত চারটি বই।

১। তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ।

২। মাযহাব মানি কেন?

৩। ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর কেন?

৪। তারাবীর নামায বিশ রাকাআত কেন?

মজলিসে উলামায়ে আহলে সুন্নাত বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়েছে মাসিক আল-আবরারের একটি ধারাবাহিক লেখার বিশেষ সংকলন-

৫। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহীহ শুদ্ধ নামায।

এ ছাড়া জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব রচনা করেছেন দুটি বই।

৬। মাযহাব মানা ওয়াজিব কেন?

৭। আহলে হাদীসের ভ্রান্ত আকীদা।

জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারীর উস্তাদ মাওলানা মুফতী জসীমুদ্দীন রচনা করেছেন–

৮। সাইফুল মুকাল্লিদ।

জামিয়া আরবিয়া রহমানিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা মীযানুর রহমান কাসেমী রচনা করেছেন তিনটি বই।

৯। কুরআন হাদীসের আলোকে হানাফীদের আমলের সুদৃঢ় প্রমাণ।

১০। আহলে হাদীসের স্বরূপ সন্ধানে।

১১। যুগে যুগে আহলে হাদীস।

মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেব রচনা করেছেন–

১২। দলীলসহ নামাযের মাসায়েল।

মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী রচনা করেছেন-

১৩। হাদীসের আলোকে আমাদের নামায।

মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফারুক রচনা করেছেন-

১৪। আসল সালাফী ও আজকের সালাফী।

মুহাম্মদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান রচনা করেছেন-

১৫। কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রচনা করেছেন-

১৬। মাযহাব মানব কেন?

মাওলানা আব্দুর রউফ রচনা করেছেন–

১৭। লা-মাযহাব ফিতনার অন্তরালে।

মাওলানা ইসমাঈল হোসাইন যশোরী রচনা করেছেন-

১৮। সাইফুল মাযহাব।

মুফতী হিফজুর রহমান সাহেব রচনা করেন–

১৯ মাযহাব ও তাকলীদ প্রসঙ্গ।

মাওলানা মনীরুল ইসলাম রচনা করেন-

২০। উলূমে নববী ও নাসীরুদ্দীন আলবানী।

ডিভোর্সের নেপথ্য কারণ

মুফতি মুহাম্মাদ শোয়াইব

বিকারগ্রস্ত মানুষ সব সময় ছিল, এখনও আছে। সময়ের প্রয়োজন ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এসব মানুষ বাড়ছে বৈ কমছে না। বিকারগ্রস্ত সমাজের একটি বড় ব্যাধি হলো ডিভোর্স। সামান্য থেকে সামান্যতম কারণে একটি সাজানো সংসার ভেঙে খান খান। অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে ডিভোর্সের হার। ঢাকার একটি প্রভাবশালী দৈনিকের পক্ষ থেকে ডিভোর্সের প্রবণতা নিয়ে পরিচালিত এক জরিপে উঠে এসেছে এ রকম চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেই জরিপের ভিত্তিতে দেখা যায়, অধিকাংশ ডিভোর্সের ঘটনা ঘটছে মেয়েদের পক্ষ থেকে। শতকরা ৬৬ ভাগ ডিভোর্সই দেয়া হচ্ছে স্ত্রীদের পক্ষ থেকে। ডিভোর্সের ঘটনা বেশি ঘটছে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারে। সিটি করপোরেশনের হিসাব অনুযায়ী, গত বছর রাজধানীতে ডিভোর্সের ঘটনা ঘটেছে ৮২১৪ দম্পতির। এর আগে ২০১২ সালে ৭৬৭২ দম্পতির মধ্যে ডিভোর্সের ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ৬১০ দম্পতির ডিভোর্স হয়েছে। তার মধ্যে ৪২৬ ডিভোর্সই ঘটেছে স্ত্রী কর্তৃক, যার ফিরিস্তি সুদীর্ঘ।

নারীরা কেন অত সহজেই ডিভোর্স দিয়ে একটি সাজানো সংসারকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে–বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করলে বেরিয়ে আসে নানা তথ্য। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এর অধিকাংশই ধর্ম পালন ও নৈতিকতার চর্চার সঙ্গে জড়িত। যেসব পরিবারে ধর্ম ও নৈতিকতার চর্চা কম হয়, সেখানেই এ ধরনের বিপত্তি বেশি ঘটে বলে গবেষণায় বেরিয়ে আসে।

ইসলাম অর্থই শান্তি। শান্তি বিনষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোনো বিধান রাখা হয়নি ইসলামে। তাই শান্তির ধারা অব্যাহত রাখতেই ইসলামে তালাক প্রথা বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। যদি তালাক প্রথা না থাকত তাহলে দেখা যেত, অনেক স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিষহ হয়ে গেলেও তারা আমৃত্যু অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হতো। যেমন মনে করুন, একজন পুরুষ বিবাহ করার পরপরই দেখল যে, তার নব বিবাহিতা স্ত্রী-স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর কাউকেই মান্য করছে না; বরং সে নিজের খেয়াল খুশিমতো চলাফেরা করছে, অথবা কোনো নারী বিবাহের পরপরই লক্ষ করল, তার স্বামী উশৃঙ্খল, মাতাল, অথবা অসৎ চরিত্রের লোক। এ অবস্থায় যদি তালাকের বিধান রাখা না হতো তাহলে স্বামী-স্ত্রী দুজনের জীবনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। এ থেকে পরিত্রাণের জন্যই ইসলাম তালাকের বিধান রেখেছে। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম।

তবে দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল তালাক ও ডিভোর্সের বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সঠিক জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রী অপাত্রেই এর প্রয়োগ বেশি করে। অনেকে এ-সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়িল জিজ্ঞেস করতেও সংকোচবোধ করে থাকেন। কেউ আলোচনা করলে ভদ্রতা ও শালীনতা পরিপন্থী মনে করে থাকেন। এ কারণেই স্বামী-স্ত্রী তালাক বা ডিভোর্সের ব্যাপারে বড় বড় ভুল করে থাকে।

তালাক আরবি শব্দ। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে বর্জন, প্রত্যাখ্যান, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি। ইসলামী আইন মতে সহজ কথায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোকে তালাক বলা হয়। তালাক হলো আবগাজুল মুবাহাত তথা নিকৃষ্টতম বৈধ কাজ। তাই এর ব্যবহার একেবারেই নিয়ন্ত্রিত হওয়া জরুরি। এই জন্যই শরীয়ত তালাকের অধিকার দিয়েছে পুরুষকে। যাতে সাধারণ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে তালাকের ছড়াছড়ি না হয়। কেননা চিন্তাশক্তি, বিচার-বিবেচনার সামর্থ্য ও ধৈর্যের গুণ নারীদের তুলনায় পুরুষদের মাঝে অনেক বেশি। তবে কোনো স্বামী যাতে স্ত্রীদেরকে আটকে রেখে তার ওপর জুলুম-নির্যাতন করতে না পারে সেজন্য ইসলামী শরীয়ত 'তাফয়ীজুত তালাক'-এর নিয়ম প্রবর্তন করেছে। তাফয়ীজুত তালাকের অর্থ হলো স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নিজের ওপর তালাক গ্রহণের অধিকার দেয়া। ইংরেজিতে যাকে ডিভোর্স (Divorce) বলা হয়। কাবিন নামার ১৮ নং ধারাটি মূলত এই উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে, যাতে স্ত্রী তার অধিকার হতে বঞ্চিত না হয়। এই অধিকার শর্ত সাপেক্ষেও হতে পারে, আবার বিনা শর্তেও হতে পারে। যদি শর্ত সাপেক্ষে হয় তাহলে সেই শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল স্ত্রী তালাক গ্রহণের অধিকারী হবে। অন্যথায় নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাকদানের ক্ষমতা একমাত্র স্বামীর। স্ত্রী তালাকদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে না। স্ত্রী হচ্ছে তালাকের পাত্রী। তাই স্ত্রী স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজের নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করবে। সে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। আমাদের সমাজে অনেককে তালাক

নামায় লিখতে দেখা যায়, 'স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্বামীকে তালাক দিলাম' এভাবে লেখা সঠিক নয়। এই পদ্ধতিতে লিখলে তার ওপর তালাক পতিত হবে না। বরং সে যথারীতি তার স্ত্রী হিসেবেই থাকবে। মহিলা যদি অন্যত্র বিবাহ বসে তাহলে তার দ্বিতীয় বিবাহও শুদ্ধ হবে না। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে থাকাটা তার জন্য যেনার গুনাহ হবে। তাই এভাবে লিখতে হবে যে, 'আমি কাবিন নামার ১৮ নং ধারায় স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করলাম।' ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক বা ডিভোর্স অত্যন্ত নিন্দনীয়। দু'জন অপরিচিত নর-নারী যেমন হাজারো আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রঙিন স্বপ্ন নিয়ে আমৃত্যু একত্রে থাকার লক্ষ্যে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইসলামও চায় তাদের এই পবিত্র বন্ধন অটুট থাকুক। তার পরও বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী অনেক সময় তালাক বা ডিভোর্সের দ্বারস্থ হয়ে থাকে।

তবে বিবাহ বিচ্ছেদ তালাকের মাধ্যমে হোক বা ডিভোর্সের মাধ্যমে হোক, ইসলামী শরীয়ত তা অপছন্দ করেছে। ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক চিরদিন অটুট থাকুক। তাই ইসলাম তালাক ও ডিভোর্সকে নিরুৎসাহিত করেছে। পবিত্র কুরআনের একটি বাণী বা হাদিসের একটি উদ্ধৃতিও এমন পাওয়া যাবে না, যা তালাক বা ডিভোর্সের প্রতি উৎসাহিত করে। তালাক দেয়া জায়েজ হলেও তা জঘন্য ঘৃণ্য কর্ম। নিম্নের কয়েকটি হাদিস থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে–

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'তালাক ইসলামের বৈধ বিষয়াদির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।'

২. তিনি আরও ইরশাদ করেন, 'যখন কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলার আরশ কেঁপে ওঠে।'

৩. জনৈক ব্যক্তি একই সাথে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শোনালে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আমি তোমাদের মাঝে এখনও জীবিত আছি, অথচ তোমরা কুরআন নিয়ে খেলা করছো?

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'তোমরা বিবাহ করো; কিন্তু তালাক দিয়ো না। যে পুরুষ বা নারী বিভিন্ন স্থানের স্বাদ গ্রহণ করে তাকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।'

৫. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও ইরশাদ করেন, 'যে স্ত্রী বিশেষ কারণ ছাড়া স্বেচ্ছায় স্বামীর কাছে তালাক চাইবে, তার জন্য বেহেশত হারাম।

এ ধরনের অসংখ্য হাদিস আছে। যেগুলো দ্বারা মূলত তালাক প্রদানকে নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তার পরও প্রয়োজনের সময় তালাক দেয়া একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তবে মেয়েদের পক্ষ থেকে যে হারে ডিভোর্সের ঘটনা ঘটছে, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। কী কী কারণে মেয়েরা সাধারণত ডিভোর্স দিয়ে থাকে, এ প্রবন্ধে আমরা তা ক্ষতিয়ে দেখার চেষ্টা করব।

যেসব কারণে মেয়েরা সাধারণত ডিভোর্স দিয়ে থাকে :

১. স্বামী-স্ত্রীর যেকোনো একজনের পরকীয়া আসক্ততা।

২. স্বামী কর্তৃক স্ত্রী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়া।

৩. স্ত্রীদের অবাধ্যতা, বেপরোয়া চলেফেরা ও ধর্মীয় অনুশাসনের তোয়াক্কা না করায় স্বামীদের পক্ষ থেকে অবহেলার শিকার হওয়া।

৪. প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে পারিবারিক সিদ্ধান্তে অন্যত্র বিয়ে দেয়া।

৫. পেশাগত ব্যস্ততা ও সাংসারিক কাজ একসঙ্গে সামাল দিতে গিয়ে অত্যধিক চাপে পড়া ।

৬. স্বামী দীর্ঘদিন দেশের বাইরে অবস্থান করা।

৭. স্বামীর পক্ষ থেকে মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করা বা যৌতুক দিতে অসম্মতি জানালে শরীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হওয়া।

৮. স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার বা একাধিক স্ত্রী থাকলে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হওয়া।

৯. প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করলেও প্রেমিকের প্রতি আকর্ষণ থাকার কারণে স্বামীর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া।

১০. স্বামীর পরিবারে ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ না থাকা বা স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম চাপ সহ্য করে আসা।

১১. দাম্পত্য কলহ অব্যাহত থাকা ।

১২. একে অপরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠা।

স্বামীর স্ত্রীর যেকোনো একজনের পরকীয়া আসক্তি :

সাধারণত আমাদের সমাজে অধিকাংশ ডিভোর্সের ঘটনা ঘটে পরকীয়া সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার কারণে ছেলেমেয়েরা জড়িয়ে পড়ে পরকীয়া অবৈধ সম্পর্কে। মোবাইল ফোনে প্রেমের ফাঁদে পড়ে, বা অন্য কোনো প্রলোভনে পড়ে মেয়েরা সহজেই ডিভোর্স দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে। অনেকে তো সরাসরি না দেখে শুধু মোবাইল ফোনের ওপর ভিত্তি করে প্রেম করে দীর্ঘদিন। আবার প্রেমিকের পক্ষ

থেকে বিবাহের প্রলোভন পেয়ে ধ্বংস করে দেয় সুখের সংসার। এরপর একের পর এক নানা অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ একটি রক্ষণশীল ইসলামী দেশ। এ দেশে কোনো বাবা-মা'ই সন্তানের অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক বা পরকীয়া আসক্তিকে মেনে নিতে পারেন না। ফলে অনেক বিয়েতেই অভিভাবকগণ ছেলেমেয়ের কথাকে উপেক্ষা করে পারিবারিক সিদ্ধান্তে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দেন। আর তখনই ঘটে বিপত্তি। মেয়েরা ডিভোর্স দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামী শরীয়ত পরকীয়া সম্পর্ককে কোনো অবস্থাতেই বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয় না। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহবহির্ভূত যেকোনো যৌন সম্পর্ক হারাম ও সমাজ ধ্বংসের কারণ। এ ধরনের নোংরা যৌন সম্পর্কই সমাজে নষ্টামি ছড়ায়।

স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়া :

একথা অস্বীকার করার জো নেই যে, অনেক স্ত্রীই স্বামী কর্তৃক মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় এবং একপর্যায়ে তারা স্বামীর সংসারের প্রতি এমনকি নিজের গর্ভের সন্তানের প্রতিও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। উপায়ান্তর না পেয়ে তারা ডিভোর্স দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইসলাম স্ত্রীকে নির্যাতন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। স্ত্রী হিসেবে ইসলাম নারী জাতিকে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে ভালো আচরণ করার। আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে বসবাস করো সদাচারের সাথে। আর যদি তোমরা কোনো কারণে তাদেরকে অপছন্দ করো, তাহলে হয়তো তোমরা এমন একটি বস্তুকে অপছন্দ করলে, যাতে আল্লাহ তা'আলা প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা নিসা : ১৯) এক হাদিসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে অপছন্দ না করে।' (সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৪৬৯, সুনানে ইবনে মাজা : হাদিস নং ১৯৭৯) এই হাদিসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাম্পত্য জীবনের কলহ নিরসন ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণের একটি মূলনীতি বলেছেন। স্ত্রীর সব আচরণ স্বামীর কাছে ভালো লাগবে, এটা অসম্ভব। আবার স্বামীর সব আচরণ স্ত্রীর কাছে ভালো না লাগাই স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ তা'আলা কাউকেই পূর্ণতা দান করে সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেকের ভেতরেই কিছু না কিছু মন্দ স্বভাব থাকবে। ভালো ও মন্দ মিলেই মানুষ। কাজেই স্ত্রীর কোনো স্বভাব স্বামীর কাছে অপছন্দ হলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। স্ত্রীর ভালো গুণগুলোর দিকে লক্ষ করে আল্লাহর শোকর আদায় করবে এবং তার প্রশংসা করবে।

এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বামীর জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনই উত্তম আদর্শ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ঘরে যেতেন স্ত্রীদের সঙ্গে ঘরের কাজে শরিক হতেন। তাদের সাথে সদাচার করতেন। স্ত্রীদের সঙ্গে খোশগল্প করতেন। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কোনো স্ত্রীকে প্রহার করেননি। তিনি যখন তাহাজ্জুদের সময় উঠতেন, তখন খুব আস্তে দরজা খুলতেন, যাতে ঘরের লোকদের ঘুমে ব্যাঘাত না হয়। তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। (তিরমিজী শরিফ হাদিস নং ১১৬৩) অন্য হাদিসে আছে তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।' (জামে তিরমিজী হাদিস নং ১১৬২)

স্ত্রীদের অবাধ্যতা, বেপরোয়া চলাফেরা ও ধর্মীয় অনুশাসনের তোয়াক্কা না করায় স্বামীদের পক্ষ থেকে অবহেলার শিকার হওয়া :

অনেক স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীদের অভিযোগ আছে যে, তারা স্বামীদের কথা মান্য করে না। বেপরোয়া, অশালীন ও উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা করে। এতে স্বামীরা ক্রমেই তাদের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। স্বামীদের কাছে অবহেলার শিকার হয়ে তারা একপর্যায়ে ডিভোর্সকেই সমস্যার সমাধান হিসেবে বেছে নেয়। আবেগপ্রবণ হয়ে ডিভোর্স দিলেও অধিকাংশ স্ত্রী পরবর্তীতে এর জন্য অনুতপ্ত হয়। কিন্তু নারীরা যদি পর্দাসহ ইসলামী শরীয়া পরিপালনে যত্নবান হতো, তাহলে এ ধরনের বিপত্তি তো ঘটতই না, উপরন্তু তারা স্বামীদের কাছে প্রিয়পাত্রও হয়ে থাকত। একটি অপ্রিয় বাস্তবতা হলো, আমাদের সমাজের কিছু মেয়ের উগ্র, অশালীন, যৌন সুড়সুড়িমূলক চলাফেরা সমাজের অন্যান্য মেয়েকেও পরোক্ষভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক মেয়ে এত টাইট পোশাক পরে যে, তাদের দেহের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। আবার অনেক মেয়ে এত পাতলা পোশাক পরিধান করে যে, তাদের পোশাক পরা আর না পরা, একই কথা। আমাদের সমাজের মেয়েরা খুবই অনুকরণপ্রিয়। যেকোনো নতুন কিছু বের হলেই তারা তার অনুসরণ করবে। সেটা ভালো হোক বা খারাপ হোক, সে চিন্তা করার সুযোগ নেই। বিজাতিদের অনুকরণ করতে গিয়ে অনেক নারী এতটাই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন, যা কোনো

সুস্থ-রুচিশীল স্বামীর পক্ষে মেনে নেয়াটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া অনেক দ্বীনদার পুরুষ নিজেদের স্ত্রীদেরকে পর্দায় রাখতে চান। কিন্তু স্ত্রীরা পর্দা না করে চলার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। মনোমালিন্য থেকে ঝগড়া-বিবাদ, একপর্যায়ে তা বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। এ ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের মেয়েরা যদি ইসলামের বিধান মেনে চলে তাহলে এ ধরনের অনেক সমস্যা আপনা থেকেই দূরীভূত হয়ে যায়। নারীদের মনে রাখতে হবে, নারীর নারীত্ব, সতিত্ব কোটি টাকা মূল্যের মাণিক্যের চেয়েও অধিক মূল্যবান। এ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বয়ং নারীকেই প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাই ইসলামী শরীয়ত পর্দার বিধান দিয়েছে। সূরায়ে নূরের ৩১ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'হে নবী! মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চক্ষুকে সংযত রাখে। লজ্জা স্থান হেফাজত করে এবং যা সাধারণত প্রকাশমান। তা ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ যেন প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের বক্ষদেশের ওপর ওড়না টেনে নেয়।'

প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে পারিবারিক সিদ্ধান্তে অন্যত্র বিয়ে দেয়া :

অনেক ছেলেমেয়ে বিবাহপূর্ব প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেমের একপর্যায়ে পরস্পরকে বিবাহ করার অঙ্গীকারও করে থাকে। অনেক সময় ভালোবাসা এতটাই গভীরে গড়ায় যে, একজন অপরজন ছাড়া জীবনধারণের কল্পনাও করতে পারে না। ইসলাম কখনোই এটা স্বীকৃতি দেয় না যে, প্রথমে ভালোবাসা হবে, এরপর বিয়ে। এটা এমন একটি পথ, যার শুরুটা অকল্যাণকর এবং শেষটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতৃপ্তিকর। যৌবনের জোশে যে প্রেম হয়, তা মূলত বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ও দূরদর্শী কোনো সিদ্ধান্ত নয়; বরং অনেকটাই আবেগনির্ভর। তাই কিছুদিন পরে যখন আবেগের মধ্যে ভাটা পড়ে তখন ছেলেমেয়ের সামনে তাদের মাঝে বিদ্যমান বংশীয় বৈষম্য ও অন্য প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রকটভাবে ধরা পড়ে। ফলে তাদের বৈবাহিক জীবনে নেমে আসে অশান্তি ও অতৃপ্তি। তাই বিবাহের ক্ষেত্রে মূলত ছেলেমেয়ে প্রত্যেকে একে অপরকে জেনে-বুঝে নেবে। প্রত্যেকে চিন্তা করে নেবে যে, তাদের পবিত্র সম্পর্কে প্রতিবন্ধক হতে পারে–এমন বিষয় নেই তো! এর পরই বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

পেশাগত ব্যস্ততা ও সাংসারিক কাজ একসাথে সামাল দিতে গিয়ে অত্যধিক চাপে পড়া :

অনেক নারী চাকরি করেন। সারা দিন বাহিরের পেশাগত কাজ সামাল দিয়ে আবার ঘরে এসে যখন ঘরের কাজও করতে হয় এবং স্বামী বা অন্য কাউকে সহযোগী হিসেবে না পায়, তখন নারী অতিষ্ঠ হয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে একাকী বসবাস করাকেই ভালো মনে করেন। ফলশ্রুতিতে তারা ডিভোর্স দিয়ে নিজেকে স্বামীর সংসার থেকে মুক্ত করার মতো জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইসলাম নারী-পুরুষের মাঝে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। পুরুষ-নারী জীবনধারণের ক্ষেত্রে সমান। যদিও নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা। নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হলো ঘর। ঘরের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে আদর্শ ঘরনী হিসেবে গড়ে ওঠাই নারীর কাজ। তবে জীবিকার প্রয়োজনে অপরাগতার সময় শরয়ী পর্দার বিধান পরিপূর্ণ মেনে নারী বাহিরে গিয়ে নিজের জীবিকা অর্জন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সেই অধিকার ইসলাম তাকে দিয়েছে। তবে আমাদের সমাজে নারীদের চাকরি করাটা যেন ফ্যাশন হয়ে গেছে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নারীরা চাকরির অজুহাত দিয়ে ঘরের বাইরে যায়। স্বভাবতই ঘরের বাইরের পরিবেশ নারীদের জন্য উপযোগী নয়। সেখানে তারা পুরুষ কর্তৃক যৌন নির্যাতন, ইভ টিজিং ইত্যাদির শিকার হয়। আবার তাদেরকে বাহিরে দীর্ঘ সময় কাজ করার পর ঘরকন্যার কাজও সামাল দিতে হয়, যা কোমল স্বভাবের নারীদের জন্য একটি বোঝা বৈ কিছুই নয়। এই বোঝা তারা বইতে না পেরে অনেক সময় ডিভোর্স দিয়ে স্বামীর সংসার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নারী অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরের কজকর্ম করতে যাবে না। এটাই শরীয়তের মূলনীতি। হ্যাঁ, একদম বাধ্য হলে সেটা ভিন্ন কথা।

আমাদের সমাজের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বলতে চান যে, নারীদেরও পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চাকরি করা দরকার। কারণ নারীরা চাকরি করলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তাদেরকে ঘরকন্যার কাজে সীমিত রাখলে দেশ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া নারীদের মধ্যে অলাভজনক কাজে সময় নষ্ট করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। আলসেমি অভ্যাস সৃষ্টি হয়। তাছাড়া তারা বাইরের কাজকর্ম না করার কারণে অত্যধিক মোটা হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের যেসব নারী ঘরের বাইরে কাজ করে, তারা মুটিয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে অনেকটা নিরাপদ। এসব চটকদার যুক্তি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বাস্তবে হালে পানি পায় না।

প্রথমত : নারীরা চাকরি করলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। নারীরা তাদের স্বাভাবিক

গণ্ডির বাইরে গিয়ে যখন চাকরি ইত্যাদি করে, তখন পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিচরণ বাধাগ্রস্ত হয়। পুরুষদের বেকারত্ব ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাই দেখা যায়, যেসব দেশে নারীরা চাকরি শুরু করেছে, সেসব দেশে পুরুষরা ক্রমেই বেকার হয়ে পড়ছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও গ্র্যাজুয়েট তো বটেই–এমনকি বড় বড় ডিগ্রিধারীও বেকার হয়ে অফিসে অফিসে চাকরির জন্য ধরনা দিচ্ছে। অন্যদিকে তাদের স্থানগুলো দখল করে রেখেছে এমন সব নারী, যারা যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতায় পুরুষদের সমকক্ষ নয়। ইদানীং এই সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে সৃষ্টি হচেছ বলে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে।

দ্বিতীয় : যখন প্রমাণিত হলো যে নারীদের চাকরি পুরুষদের বেকারত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, একটি কর্মজীবী নারী তার নিজের স্বামী, বাবা বা ভাইয়ের বেকারত্বের কারণ হচ্ছে। আর যে পরিবারে নারী সদস্যের চাকরির কারণে পরিবারপ্রধান বা অন্যান্য পুরুষ চাকরি বঞ্চিত হচ্ছে এবং বেকারত্বের গ্লানি বহন করছে, সে পরিবারে অর্থনৈতিক ভিত কতটুকু মজবুত হবে, তা ভেবে দেখা দরকার।

তৃতীয় : জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি সব সময় অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠিতে মাপা যায় না। আমরা দেখতে পাচ্ছি নারীর চাকরিতে জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটলেও এর দ্বারা জাতির অপূরণীয় সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের নারীরা চাকরি করার কারণে তাদের পারিবারিক কাঠামো ভেঙে গেছে। ছেলেমেয়েদের চরিত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এত সব ক্ষতি মেনে নিয়ে কি আমরা শুধু অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভাবব, না নৈতিকতার দিকটির প্রতিও গুরুত্ব দেব?

আরেকটি বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কোনো মানবসমাজ যদি নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পারিবারিক মূল্যবোধকে দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব দেয় তাহলে সেখানে সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারে না। কমিউনিস্ট সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিবার, সমাজ ও নারীদেরকে যেভাবে দেখে, একটি ইসলামী সমাজের জন্য সে দৃষ্টিতে তাকালে হবে না। তাছাড়া সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সমাজের বা দেশের উৎপাদক যন্ত্র ভাবলে চলবে না; বরং সমাজের বা দেশের কোনো কোনো সদস্যকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চেয়ে উত্তম কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার কারণে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। যেমন–দেশের সেনাবাহিনীকে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে অন্য সব কাজ থেকে মুক্ত রাখা হয়। কারণ তারা অর্থনৈতিক উপার্জনের চেয়ে অধিক মূল্যবান স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত আছে। সুতরাং আমাদেরকেও দেখতে হবে যে, নারীরা সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটির আঞ্জাম দিচ্ছে। কাজেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা বলে তাদের আপন ক্ষেত্র থেকে বের করে আনা কোনো জ্ঞানীর কাজ নয়।

পরস্পরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠা : আমাদের সমাজের অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অহেতুক নানা সন্দেহ করার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অকারণেই প্রিয় মানুষটির প্রতি প্রশ্নবোধক চিহ্নের উদয় হয়। তার কথার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না। যোগাযোগ কমে যায়। প্রত্যেকেই কল্পনার পাহাড় বানিয়ে তার প্রিয় মানুষের ব্যাপারে নানা নেতিবাচক ভাবনা ভাবতে থাকে। অহেতুক একজন অপরজনের সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এ জন্য অপরকে দোষারোপ করার আগে নিজেকে ভাবা উচিত যে, আমি কতটা সৎ ও নিষ্ঠাবান। তার স্থলে আগে নিজেকে বসানো উচিত। ভেবে দেখা উচিত, তার স্থলে আমি হলে এবং আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হলে কেমন হতো। অন্যথায় পরবর্তীতে যখন ভুল ভেঙে যাবে, তখন নিজেকেই অপরাধবোধে ভুগতে হবে।

দাম্পত্য কলহ

অনেক সময় দাম্পত্য কলহ দীর্ঘায়িত হলে তাও ডিভোর্সের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের সমাজে দাম্পত্য কলহ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। দাম্পত্য কলহের সূত্র ধরে তালাক, ডিভোর্সের ঘটনাও ঘটছে দেদার। স্বামী-স্ত্রীর চলার পথে মান-অভিমান, ভুল-ভ্রান্তি স্বাভাবিক বিষয়। তবে এই স্বাভাবিক বিষয় যখন কলহে রূপ নেয় এবং তা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে তখনই বিপত্তি ঘটে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের আজীবন সঙ্গী। শরীয়তসম্মত পন্থায় দুজন নারী-পুরুষের মাঝে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তা-ই দাম্পত্য সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে অটুট রাখার প্রতি ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। তাই দাম্পত্য কলহ নিরসনে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। আসলে আমাদের যাবতীয় সমস্যার মূল কারণ হলো আমরা ইসলামের সুমহান আদর্শ ত্যাগ করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে জলাঞ্জলি দিয়ে শান্তি খুঁজি নিজেদের মনগড়া বানানো মতবাদে। দাম্পত্য কলহ নিরসনে ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসার বিকল্প নেই। স্বামী-স্ত্রীর

মাঝে সাধারণত যে কলহ দেখা দেয় তার মূল কারণ হলো প্রত্যেকেই নিজের অধিকার সম্পর্কে ষোলোআনা সচেতন, অন্যের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে চরম অসচেতন। প্রত্যেকে যদি অন্যের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন থাকে তাহলে দাম্পত্য কলহের কোনো সুযোগ থাকে না।

ইসলামী বিধানে স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেসব হক বা অধিকার রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে–

☆ স্বামীর আনুগত্যে থাকা ও তার খেদমত করা।

☆ স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া, নিজে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া।

☆ স্বামীর সাধ্যের বাইরে কোনো কিছুর আবদার না করা।

☆ স্বামীর সম্পদ বিশ্বস্ততার সঙ্গে হেফাজত করা এবং নিজের সতিত্বকেও হেফাজত করা।

☆ শরীয়তসম্মত ওজর না থাকলে স্বামীর আহ্বানে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়া।

স্বামীর ওপর স্ত্রীর যেসব হক বা অধিকার রয়েছে তা হলো–

☆ স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।

☆ তার মহর আদায় করে দেয়া।

☆ বসবাসের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া।

☆ সম্ভব হলে চাকরানির ব্যবস্থা করা।

☆ একাধিক স্ত্রী থাকলে ভরণপোষণ ও রাত্রি যাপনে সমতা রক্ষা করা।

এসব অধিকারের দিকে যদি স্বামী-স্ত্রী যত্নবান হয় তাহলে দাম্পত্য জীবন হবে কলহমুক্ত।

স্বামীর পরিবারে ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ না থাকা বা স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম চাপ আসতে থাকা :

স্বামীর পরিবারে ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ না থাকা, স্বামীর পরিবারের বিভিন্ন রকম চাপ সহ্য করতে না পারাও ডিভোর্সের অন্যতম কারণ। পারিবারিক কলহ বলতে সাধারণত বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্বই আমরা বুঝে থাকি।

বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্বের কথা আমাদের সমাজে প্রায়ই শোনা যায়। শাশুড়ির প্রতি বউয়ের এক বস্তা অভিযোগ– শাশুড়ি ভালো না, শুধু জ্বালাতন করে, দোষ খুঁজে বেড়ায়। বউয়ের প্রতি শাশুড়ির অনুযোগ–বউ অলস, অকর্মা, মান্যতা নেই ইত্যাদি। মোটকথা, বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্ব আমাদের সমাজের চিরায়ত চিত্র। অথচ একটি সংসার আনন্দময়, সুখময় ও ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য বউ-শাশুড়ির মিল-মোহাব্বত অত্যন্ত জরুরি। বউ-শাশুড়ির মাঝে যদি মিল-মোহাব্বত থাকে তাহলে সংসারে সুখ-সমৃদ্ধির জোয়ার আসে। সংসার হয়ে ওঠে জান্নাতের টুকরা। আর যদি সংসারের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের মাঝে বিরূপ সম্পর্ক থাকে, তাহলে সংসারের শান্তি হয়ে যায় সোনার হরিণ। জীবন তখন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। সংসারটা হয়ে যায় জাহান্নামের টুকরা। একটি সংসারকে সুখ-সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করার জন্য যেমনি প্রয়োজন শাশুড়ির সুনিপুণ পরিচালনা, তেমনি প্রয়োজন বউয়ের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা। তাদের দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংসারে প্রবাহিত হতে পারে সুখ-শান্তির নির্মল হাওয়া। সেজন্য বউ-শাশুড়ির সংঘাত নিরসনে তাদের উভয়েরই মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। উভয়েরই পরস্পরকে ছাড় দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের সমাজে দেখা যায়, বউ-শাশুড়ি দুজনের কেউই বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নয়। উভয়েই পূর্ণ পাওয়ার খাটাতে চায়, যার অনিবার্য ফল হিসেবে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে উভয়ে যদি একে অপরকে ছাড় দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করে, তাহলে অতি সহজেই এ সংকট নিরসন করা সম্ভব।

বউ তার শাশুড়িকে শ্রদ্ধা করবে। মনে করবে তার শাশুড়ি তার জন্য জননীতুল্য শ্রদ্ধার পাত্র। শ্বশুরকে মনে করবে পিতাতুল্য। পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তার আচরণ হবে হৃদ্যতাপূর্ণ। অন্যদিকে শাশুড়িকে মনে করতে হবে নব অতিথি বউ তার সংসারের সৌন্দর্য। তার বাড়ির শোভা। বাড়ির প্রত্যেক সদস্য যেন তাকে আপন করে নেয়, তার সঙ্গে আপনজনের মতো আচরণ করে, সেদিকে শাশুড়িকেই খেয়াল রাখতে হবে। একে অপরের প্রতি পূর্ণ সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। অনেক শাশুড়ি আছেন বউয়ের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন। এমন কাজকর্মও পুত্রবধূর কাঁধে চাপিয়ে দেন, যা মূলত তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার সেই কাজটি সম্পাদন করা তার জন্য দুরূহ ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণ হলো, বউ-শাশুড়ি কেউই স্ব স্ব দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। বরং তারা একতরফাভাবে অধিকার ভোগ করতে চান। ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক বউ-শাশুড়ির জন্য যেসব বিধিবিধান প্রদান করা হয়েছে, শরীয়তের সেসব বিধান পালনে তারা চরম অমনোযোগী।

বউয়ের দায়িত্ব হলো, শাশুড়িকে সম্মান করা। যৌথ পরিবার হলে তার নির্দেশমতো সংসার চালানো। শাশুড়িকে নিজের প্রতিপক্ষ বা শত্রু না ভাবা। বউয়ের চিন্তা করা উচিত যে, শাশুড়ি যদি তার প্রতিপক্ষ বা শত্রু হতো তাহলে তাকে ছেলের বউ করে ঘরে তুলত না।

অনেক বউ আছে শাশুড়ি বা ননদের কথা তিলকে তাল বানিয়ে স্বামীর কাছে মায়াকান্না করে স্বামী ও তার মা-বোনদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে দেয়। স্বামী বেচারা ও ধূর্ত স্ত্রীর প্রতারণায় পড়ে মা-বোনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এতে মা-ছেলের মায়া জড়ানো সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায় এবং মা বেচারি খুবই অপমান বোধ করেন। বউয়ের মনে রাখা উচিত যে, স্বামীর খেদমত করা মহান আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ফরজ করে দিয়েছেন, তার জন্মদাতা মাকে খুশি করলে সে নিশ্চয় খুশি হবে। এতে তার স্বামীর জান্নাতের রাস্তাও যেমন সুগম হবে, তেমনি তার দুনিয়া ও আখেরাত কল্যাণকর হবে।

শাশুড়ির উচিত বউকে নিজ সন্তানের মতো আপন করে নেয়া। শাশুড়িকে ভাবতে হবে যে, বউ তার বাবা-মা, ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজনের মায়া ত্যাগ করে স্বামীর হাত ধরে শ্বশুরালয়ে চলে এসেছে। তার আত্মীয়স্বজনকে সে আপন করে নিয়েছে। যার সাথে জীবনে কখনো দেখা-সাক্ষাৎ নেই, পরিচয় নেই, এমন একজন অপরিচিত পুরুষ ও নারীকে নিজের অন্তরে সে বাবা-মার স্থান দিয়েছে। সেই অপরিচিত পুরুষকে সে বাবা বলে ডাকছে। আর অপরিচিত মহিলাকে মা বলে ডাকছে। সুতরাং তার সঙ্গে আদর-সোহাগের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। বউয়ের সাধারণ ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিতে হবে। মারাত্মক কোনো অন্যায় করলে স্নেহ-মমতা দিয়ে তা শোধরাতে হবে। এতে মেজাজি বউও আস্তে আস্তে পোষ মানতে বাধ্য হবে। পক্ষান্তরে কর্কশ আচরণ করা হলে বউ বিগড়ে গিয়ে অযাচিত আচরণ করতে থাকবে। একপর্যায়ে তুমুল ঝগড়া-বিবাদ–এমনকি ছাড়াছাড়ির পর্যায়ে চলে যেতে পারে। শাশুড়িকে মনে রাখতে হবে যে, চোখ রাঙ্গিয়ে রূঢ় আচরণ করে যা করা যায় না, তা করা যায় মধুর আচরণ দ্বারা।

ঘর-সংসার করা বউয়ের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা, সে কখনো এ কাজ করে আসেনি। সব কিছু তার জন্য নতুন। সুতরাং ঘর গোছানো, রান্নাবান্না করা, অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করা। মোটকথা, সব কিছুতেই তার ভুল-ত্রুটি হতে পারে। এই ভুল-ত্রুটিগুলো শাশুড়িও হয়তো কোনো একসময় করেছিলেন। তার শাশুড়িও তা মেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং এখন তাকে তার পুত্রবধূর সাথে সে আচরণটাই করতে হবে, যে আচরণ সে অন্যের পুত্রবধূ থাকাবস্থায় তার শাশুড়ির কাছ থেকে কামনা করেছিলেন।

শাশুড়িকে মনে রাখতে হবে, তার নিজের শরীরের যেমন আরাম-আয়েশের অনুভূত হয়, তার বউয়েরও তেমনি রক্ত-মাংসে গড়া শরীর। তারও প্রয়োজন হয় একটু আরামের, একটু বিশ্রামের। সুতরাং তাকে বিশ্রামের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। তার ছেলের বউ তো তার ক্রয় করা দাসী নয়। সুতরাং তার ওপর সংসারের সমস্ত কাজ চাপিয়ে দিয়ে শাশুড়ি তার ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে আমগাছের নিচে বসে দখিনা হাওয়া খাবে, ওই দিকে বউ বেচারির কাজের চাপে প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে–এটা অবশ্যই অমানবিক। তার ওপর যেমন স্বামীর অধিকার রয়েছে, তেমনি তার স্বামীর ওপরও তার অধিকার রয়েছে। তাছাড়া শাশুড়িও একদিন বউ ছিল। তখন সে তার শাশুড়ির কাছ থেকে যেমন আচরণ কামনা করেছিল, তার পুত্রবধূও তার কাছে তেমন আচরণই কামনা করে। তিনি যখন যৌবনে ছিলেন তখন যেমন তার সমস্ত কামনা-বাসনা ও যাবতীয় শখ পূরণ করে নিয়েছিলেন, এখন তার বউয়ের পালা। তার বউও তার যাবতীয় কামনা-বাসনা পূরণ করে নিতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই পুত্রবধূ কোনো অন্যায় করে ফেললে তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে হবে। পুত্রবধূর সঙ্গে স্নেহের কন্যাসুলভ আচরণ করবে। সামান্য কোনো বিষয়ে তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়।

অনেক সময় শাশুড়িদের মনে এমন ধারণা আসে, আমার ছেলেটাকে এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শরীরের রক্ত পানি করে খাইয়ে দাইয়ে বড় করে তুললাম। এখন নতুন একটা মেয়ে এসে তার ওপর রাজত্ব করবে, আমার কলিজার টুকরাকে আমার হাতছাড়া করবে, এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়? তখন শাশুড়িকে চিন্তা করতে হবে যে, বাবা-মা সন্তানকে লালন-পালন করে বড় করে অন্যের হাতে তুলে দেন। এটাই মহান আল্লাহ তা'আলার অমোঘ বিধান। তিনি নিজের মেয়ের দিকে তাকাতে পারেন। এত কষ্ট করে মেয়েকে বড় করেছেন। পড়ালেখা করিয়েছেন। অতঃপর অন্যের ছেলের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেখানে তার মেয়ে রানীর হালতে থাকুক, এটাই তার কামনা। ঠিক তার পুত্রবধূ ও কোনো না কোনো মায়ের সন্তান। তার মাও কামনা করে তার মেয়ে শ্বশুরালয়ে রানীর হালতে থাকুক। নিজের মেয়ের বেলায় যেমনটি কামনা করা হয়, পুত্রবধূর ব্যাপারেও তেমনি আচরণ করতে হবে। তাহলেই সংসারে সুখ আসবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বোঝার তাওফিক দান করুন। আমীন।

এপ্রিল ফুল বনাম মুসলিম উম্মাহ

মুফতী মুর্তাজা

এপ্রিল ফুল কী?

এপ্রিল ফুল, কারো সাথে মজা করে তাকে বোকা বানানোর উৎসব। তার নির্দিষ্ট দিন এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ। এর প্রচলন প্রথমত ইউরোপ থেকে। পরবর্তীতে এর প্রচলন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আজও বিশ্বজুড়ে এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এটি দারুণ গ্রহণযোগ্যতার সাথে বিদ্যমান।

ডাচ (ওলন্দাজ) এবং ফরাসি সূত্র থেকে জানা যায়, এটি পশ্চিমা ইউরোপীয় অঞ্চলে ছিল। পরবর্তীতে আঠারো শতকে এসে এটি ইউরোপে ব্যাপকতা লাভ করে।

এপ্রিল ফুলের বাস্তব রূপ :

April এটি লাতিন শব্দ Aprilis বা Aprire থেকে, যার অর্থ : খোলা, ফুল ফোটা, অঙ্কুরিত হওয়া। প্রাচীন রোম বাসিন্দারা বসন্তের আগমণ উপলক্ষে তাদের দেবতার পূজা করত এবং দেবতাকে খুশি করার জন্য তারা মদ পান করে উদ্ভট আচরণ করণার্থে মিথ্যার আশ্রয় নিত। এই মিথ্যাই আস্তে আস্তে এপ্রিল ফুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পরিণত হয়।

ইনসাইক্লোপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী,

পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে পহেলা এপ্রিলকে মজা করার দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ওই দিন সব ধরনের অশ্লীল কাজে ছাড় দেয়া হয় এবং মিথ্যা মজা করার নামে মানুষকে বোকা বানানো হয়। এই অনর্থক এবং বোকা বানানোর প্রচলন বর্তমানে একশ্রেণীর মুসলিম সমাজেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন ছোট বাচ্চা, বুড়ো-জোয়ান সকলে আমোদ-প্রমোদ করে। কিন্তু এই আনন্দ বাস্তব হয় না, কেননা তার ভিত্তি তিনটি জিনিসের ওপর–

১. মিথ্যা

২. ধোঁকা

৩. অন্যকে ঠাট্টা করা।

যে খুশি অন্যের অন্তর ব্যথিত করার মাধ্যমে হয়, তাকে সত্যিকারের আনন্দ বলা যায় না এবং কাউকে ধোঁকা দিয়ে ও কষ্টে ফেলে যে আনন্দ অর্জন হয়, তাকে বাস্তব আনন্দ বলা হয় না। অথচ পশ্চিমা লোকেরা বড় দিয়ানতদার, সত্যবাদী ও সহমর্মী বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু পহেলা এপ্রিলে তারা তাদের এই সমস্ত গুণাবলি মুক্ত হয় এবং পশ্চিমাদের যারা অন্ধভক্ত, তারা তাদের কাজের ভালো-খারাপ দিক বিবেচনা না করেই তাদের অনুকরণে লিপ্ত হয় ও তাতে তারা দারুণ গর্ববোধ করে। যদি পশ্চিমারা উলঙ্গ হয়ে নাচা শুরু করে তাহলে এরাও নির্লজ্জের মতো নাচের মধ্যেই গর্ববোধ করে। এই পুরো কাজের মধ্যে তাদের জন্য গৌরবের বিষয় হলো তারা পশ্চিমাদের অনুকরণ করছে। এ ব্যাপারে তাদের কোনো অনুশোচনাই নেই যে, তারা কত লজ্জাজনক কাজে জড়িত।

পহেলা এপ্রিল বা এপ্রিল ফুলের মতো কুপ্রথার উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা, মানুষেরা একে অপরকে বোকা বানায় ও মিথ্যা বলে এবং যখন শ্রোতা মিথ্যাকে সত্য মনে করে, তখন লোকেরা খুশিতে অট্ট হাসি দেয় এই বুঝে যে, সে মিথ্যা বলে তার শ্রোতাকে বোকা বানাতে সক্ষম হয়েছে। তাদের এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা হয় না যে তার এই মিথ্যার কারণে অন্যের কত কষ্ট হয়েছে। অনেক সময় এ ধরনের অযথা ঠাট্টার দ্বারা খুব কষ্টদায়ক অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এর ফল মানুষকে অনেক বছর ভোগ করতে হয়।

যেমন কয়েক বছর আগে পাকিস্তানের এক যুবক এপ্রিল ফুল উদ্‌যাপনের মনস্থ করে এবং সকালবেলায় বাহিরে গলিতে চিৎকার করে। মহল্লার এক যুবক আহত অবস্থায় পড়ে আছে। তার নাড়ি-ভুঁড়ি বাহিরে পড়ে আছে এবং আশপাশে রক্ত ছড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে অনেকের মাথা ঘুরে যায়। মহল্লাবাসী ওই আহত যুবকের ঘরে খবর দিল। তার ঘরে মা-বোন ছিল। তারা কান্নাকাটি করতে করতে বেপর্দা অবস্থায় বাহির হয়ে গেল, যখন মজমা সুন্দর জমল এবং তার মা চিৎকার করতে করতে বেহুঁশ হয়ে যায়। হঠাৎ ওই ছেলেটা দাঁড়িয়ে যায় এবং সে হাসতে লাগল। এসব যা ঘটল, সব কিছুই বানানো নাটক ছিল। আর এ সমস্ত নাটক এপ্রিল ফুলের জন্য সাজানো হলো। ওই ছেলেটা কসাইখানা থেকে পশুর রক্ত মাখা নাড়ি-ভুঁড়ি এনে তার শরীরের ওপর ফেলে হাউমাউ করে কাঁদছিল, যা দেখে সবাই মনে করল তাকে খুব শক্তভাবে কেউ আঘাত করেছে, যে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে গেছে।

বাস্তবতা প্রকাশের পর মানুষ রসিকতা ও উপহাসের স্থলে অধিকতর অসন্তুষ্ট হলো। প্রত্যেক ব্যক্তি মন খুলে গালমন্দ বলতে লাগল মাও বদ্ দোয়া দিয়ে ফিরে গেল। কিছুদিন পর ওই যুবকের অবস্থা এই হলো যে, সে পাগলের মতো

আচরণ করতে লাগল। এর কিছুদিন পর সে একেবারেই পাগল হয়ে গেল এবং এই অবস্থাতেই সে উধাও হয়ে গেল আজও তার হদিস মেলেনি। জানা নেই সে জীবিত, না মৃত ।

এমনিভাবে এপ্রিল ফুলের মতো উদ্ভট দিবস পালন করতে গিয়ে মারাত্মক খেসারত দিতে হলো জর্ডানের এক সংবাদমাধ্যমকেও।

পহেলা এপ্রিল বন্ধুবান্ধব একে অন্যকে বোকা বানালেও ২০১০ সালে এ কাজে নেমেছিল জর্ডানের একটি পত্রিকা। এতে সফলও হয়েছিল পত্রিকাটি। ভিনগৃহের প্রাণীর ভয় দেখিয়ে অনেক লোককে ঘরছাড়া করে পত্রিকাটি। আর এখন এ কাজের মাসুল গুনছে তারা। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য ওই পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। খবর বিবিসির।

জর্ডানের আল ঘাদ পত্রিকা ১ এপ্রিল প্রথম পাতায় একটি খবর প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, দেশের পূর্বাঞ্চলীয় মরু শহর জাফরে তশতরি আকৃতির বিশেষ আকাশযানে চেপে ভিনগৃহের কিছু প্রাণী অবতরণ করেছে। এরা আকৃতিতে বিশাল। একেকটির উচ্চতা কম করে হলেও ১০ ফুট। পত্রিকার এ খবরে ভয় পেয়ে যায় জাফর শহরের বাসিন্দারা। ভিনগৃহের প্রাণীগুলো হামলা করতে পারে–এমন আতঙ্কে তারা শহর ছাড়তে শুরু করে।

শহরের মেয়র মোহাম্মদ মেলিহান জানান, এ খবর পড়ে ভয়ে অভিভাবকরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দেন। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়।

যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। শহরের ১৩ হাজার লোককে তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে অন্যত্র সরিয়ে নেন। এরপর বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দেন। তারা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে বিষয়টি পুরোপুরি ভুয়া। মরুভূমিতে ভিনগৃহের কোনো প্রাণীর নামগন্ধও নেই।

পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মুসা বাহুমি জানান, ১ এপ্রিল উপলক্ষে তাঁরা মজা করেছিলেন মাত্র। এ জন্য যা ঘটেছে, এর জন্য তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থী। এত শহর থাকতে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য ওই শহরকে কেন বেছে নেওয়া হলো, সে ব্যাপারে অবশ্য তিনি কিছু বলেননি।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, জাফর শহরে একসময় মার্কিন সেনাদের ঘাঁটি ছিল। যা হোক, সামান্য একটু ভুলের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল সংবাদমাধ্যমটিকে।

এপ্রিল ফুলের ইতিহাস :

এপ্রিল ফুলের মূল আবিষ্কারক কে এবং কেন তা আবিষ্কার করেছেন–এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু ইতিহাসবিদগণ এ সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণনা করেন।

ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটেনিকা এপ্রিল ফুলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উল্লেখ করে যে, তৎকালীন ফ্রান্সে নতুন বছরের সূচনা এপ্রিল মাস থেকে হতো এবং রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের নিকট দিনটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কেননা তাদের প্রসিদ্ধ দেবতা উইন্সের সাথে দিনটির বেশ যোগসূত্র ছিল। তাই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বছরের এই দিনটিকে তারা বেশ ধুমধাম করে পালন করত এবং খুব আনন্দ-উল্লাস ও মজা করত। আস্তে আস্তে মজা করা তাদের এ আয়োজনের একটি অধ্যায় হয়ে গেল। যদি ব্যাপারটা শুধু হাসি-ঠাট্টায় সীমাবদ্ধ থাকত তবুও হতো, কিন্ত না! পরবর্তীতে আনন্দ মিথ্যা বলা ও ধোঁকা দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হলো। যদি কেউ ওই মিথ্যাকে বিশ্বাস করে ফেলত অথবা তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিত, তখন সবাই তাকে হাসি-ঠাট্টা করত। আস্তে আস্তে এ দিনটি সাধারণ ক্ষমা দিবসের রূপ ধারণ করল। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষ অশ্লীলতার সকল ধাপ পার করতে লাগল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইনসাইক্লোপেডিয়া "Lord's" দ্বিতীয় আরেকটি কারণ বর্ণনা করেন এবং যদি এটি সহীহ হয় তাহলে বাস্তবে ইহুদিদের খারাপ স্বভাবে এটা অসম্ভবও নয় যে, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে এ রকম ন্যক্কারজনক আচরণ করবে। কিন্তু খ্রিস্টানদের কী হল যে তারা নিজেদের গ্রহণযোগ্য ভিত্তির এ মজবুত সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও ইহুদিদের অনুসরণ করতে গিয়ে স্বয়ং নিজেদের ধর্মীয় নেতাদের সাথে উপহাস করছে? বাস্তব হলো, অন্ধ অনুসরণ জাতির চিন্তাশক্তি নিঃশেষ করে দেয়। চিন্তার বিষয় হলো যে, এপ্রিল ফুল কাদের বিপক্ষে যাচ্ছে। এ প্রথা দ্বারা কোন ধর্মের অনুসারীদের বিদ্রূপ ও বেইজ্জতি করা হচ্ছে? শুধু ইহুদি নয়, খ্রিস্টানরাও এ কথা স্বীকার করে যে, এই দিন হযরত ঈসা (আঃ)-কে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ওই দিনই প্রহার করা হয়েছিল, তার ওপর বিদ্রূপ করা হয়েছিল। ওই দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে এই কুপ্রথা ইহুদিরা চালু করেছে। হয়তো খ্রিস্টানরা ইহুদিদের কোনো খারাপ কথাকে খারাপ আখ্যায়িত করতে পারে না। তাই তারাও এ দিবসটি পালন করে। কিন্তু মুসলমানদের তো আল্লাহ তা'আলা ঈমানী শক্তি এবং দূরদর্শিতা দান করেছেন, তাদের তো এ ধোঁকায় পড়া উচিত ছিল না। তাদের

নিকটও এ কথা এ হিসেবে ভুল হওয়া উচিত যে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন নবীর নামও অন্তর্ভুক্ত আছে? এটা মেনে নিলাম যে ঐতিহাসিকভাবে এই ঘটনাটি মিথ্যা; কিন্তু এই মিথ্যা ঘটনাটির ভিত্তিটা তো একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞসম্পন্ন নবীর কটূক্তির ওপর রাখা হয়েছে। হযরত মূফতি তুকী উসমানী সাহেব সত্য বলেছেন যে, খ্রিস্টানদের স্বভাব-চরিত্র এই বিষয়ে বিস্ময়কর। তাদের ধারণা মতে যে শূলির ওপর ঈসা (আ.)-কে চড়ানো হয়েছিল নিয়মানুযায়ী এমন হওয়া চাই যে, শূলটা তাদের নিকট ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হবে। কেননা এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-কে কষ্ট দেয়া হয়েছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, খ্রিস্টানরা এটাকে পবিত্র বলে গণ্য করা শুরু করল এবং এটা খ্রিস্টধর্মের পবিত্রতার সবচেয়ে বড় প্রতীক।

পহেলা এপ্রিলকে রাজকীয় অনুষ্ঠান এবং উৎসবের মতো উদ্‌যাপন করার পেছনে অন্য একটি ঐতিহাসিক বর্ণনাও আছে। পশ্চিমাদের জন্য এটা অসম্ভব নয় যে, বাস্তবেই ওই দিনটাকে তারা এজন্যই স্মরণীয় করে রেখেছে। যেসব মুসলমান ওই দিনে খেলতামাশার মধ্যে আনন্দ-উৎসাহের সাথে অংশ নেয় তাদের একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা উচিত যে, বাস্তবেই চিত্রটা শুধু কিছু সময় আনন্দ-ফুর্তিতে অতিবাহিত করছে? নাকি নিজেদের ঐতিহাসিক এক বেদনাদায়ক প্রতারণার ওপর নিজেরা ঠাট্টা করছে। স্পেনের মুসলমানরা আটশত বছর যাবৎ অনেক প্রতাপের সহিত রাজত্ব করেছে। সেখানকার সুরম্য মসজিদ এবং দৃষ্টিনন্দন ভবনগুলো আজও যেন ওই গৌরবময় রাজত্বের সাক্ষী হয়ে আছে। মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং মুসলিম শাসকদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন খ্রিস্টানদেরকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দিয়েছে। স্পেনের সমস্ত রাজত্ব জমিদারি একেক করে মুসলমানদের হাতছাড়া হতে লাগল। প্রথমত তিতলা, আসাবিলা অতঃপর করভা এবং অবশেষে গ্রানাডা। মুসলমানরা পশ্চাৎমুখী হতে হতে গ্রানাডায় গিয়ে জমা হয় এবং এটাই তাদের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল; যেখানে মুসলমানরা অটল থাকতে পারত। কিন্তু তাদের কপালে পরাজয় লেখা ছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, অবশেষে মুসলিম শাসক আবু আব্দুল্লাহ আল হামরা প্রাসাদের চাবি গির্জার কাছে অর্পণ করল। পোপ আবু আব্দুল্লাহর সাথে একটা অঙ্গীকার করেছিল যে, যে সমস্ত মুসলমান গ্রানাডায় অবশিষ্ট আছে তাদের জানমাল-ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। কিন্তু এই অঙ্গীকার পূরণ করা হয়নি। বরং তার বিপরীতে মুসলমানদেরকে জুলুম এবং অত্যাচারের নিশানা বানানো হয়েছে। তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে জবরদস্তি করা হয়েছে। যারা এই আদেশ মানতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করে শাস্তি দেয়া হয়েছে। অগণিত মুসলমানকে জীবিত জালিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিছু মানুষ আত্মরক্ষা করে পালিয়ে গেছে এবং পাহাড় আর গর্তের মাঝে আত্মগোপন করেছে। এই লোকদেরকে খ্রিস্টানরা এ কথা বলল যে, নিরাপত্তার সহিত তাদেরকে মালাকাশ পাঠিয়ে দেয়া হবে। মুসলমানরা তাদের প্রতারণার জালে ফেঁসে গেল। তাদের সামনে এ ছাড়া অন্য কোনো রাস্তাও ছিল না। একটি নতুন জীবন পাওয়ার আশায় অবশিষ্ট মুসলমানরা খ্রিস্টানদের তৈরীকৃত জাহাজে আরোহন করল যখন এই জাহাজ রোম সাগরে পৌঁছল তখন এই জাহাজটিকে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সমুদ্রের মাঝে ডুবিয়ে দেয়া হলো। এই বেদনাবিধূর এবং মানবপীড়িত ঘটনা ১৪৯৮ সালের পহেলা এপ্রিল সংঘটিত হয়েছিল। পশ্চিমারা এই দিনটাকে এই জন্য উদ্‌যাপন করে যাতে মুসলমানদেরকে বোকা বানিয়ে তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করার মুহূর্তটা স্মরণীয় করে রাখা যায়।

তবে অনেকের মতে গ্রানাডা যুদ্ধের যে ঘটনাটিকে এপ্রিল ফুলের ইতিহাস বলে উল্লেখ করা হয়, ইহা ঠিক নয়। কেননা ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, জোসেফ ও' কালাহানের লেখা এবং কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত A History of Medieval Spain গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। মুসলিমরা স্পেনে শাসন শুরু করে ৭১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। আল ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিক প্রথম উমাইয়া খেলাফতের পক্ষ থেকে স্পেনে শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এলাকাকে উমাইয়া খেলাফতের প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে। তবে তারা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকে। এরপর ক্ষমতায় আসে করডোবার আমিরাত (৭৫০ থেকে ৯২৯ খ্রিস্টাব্দ), করডোবার খেলাফত (৯২৯ থেকে ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ) এবং আলমনজুর (৯৩৮ থেকে ১০০২ খ্রিস্টাব্দ)। শেষের জন আসলে একজন শাসক, যিনি মুসলিম শাসনকে স্পেনে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে ইতিহাসে এর পরে দুই শত বছর একচ্ছত্র আধিপত্য দেখাতে পারেনি কোনো সুনির্দিষ্ট মুসলিম শাসক। মুসলিমদের স্পেন শাসন আবার

পাকাপোক্ত হয় মূলত ১২৩৮ সনে, যখন গ্রানাডার এমারাত প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে মুসলিমরা স্পেনের গ্রানাডাভিত্তিক একটা খুবই শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে পরিচিতি পায়।

স্পেনে যখন মুসলিমরা শাসন করেছে তখন বিভিন্ন রাজারা যা করতে পারেননি, একজন নারী হয়ে রানি ইসাবেলা তা করে দেখিয়েছিল। সে মুসলিমদের বিতাড়িত করেছিল স্পেন থেকে। প্রশ্ন জাগতে পারে, কে এই ইসাবেলা? হ্যাঁ, এই সেই ইসাবেলা, যে কলম্বাসকে আমেরিকা আবিষ্কারে পাঠিয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তগুলো স্পেনের ইতিহাসকে নতুন রূপ দিয়েছিল। ইসাবেলা অনুভব করেছিল মুসলিমদের হারাতে হলে স্পেনের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আই. এল. প্লাঙ্কেটের লেখা Isabel of Castile গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ইসাবেলা রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার কাজিন অ্যারাগনের রাজা ফার্ডিনান্ডকে বিয়ে করেছিল। এই বিয়েও খুব একটা সহজ ছিল না। কেননা সে সময় কাজিনকে বিয়ে করতে খোদ পোপের অনুমতি প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত ইসাবেলা সেটাও জোগাড় করেছিল এবং ১৯ অক্টোবর ১৪৬৯ সনে তারা বিয়ে করে।

বিয়ের পর ইসাবেলা-ফার্ডিনান্ডের প্রধান মিশন হয়ে দাঁড়ায় মুসলিমদের পরাজিত করা। ১৪৮২ সনের ১ ফেব্রুয়ারি রাজা-রানি ভ্যালাডোলিড প্রদেশের মেডিনা ডেল ক্যাম্পোতে এসে পৌঁছান গ্রানাডা আক্রমণের লক্ষ্য নিয়ে। জন অ্যাডওয়ার্ড তার লেখা পিয়ারসন এডুকেশন থেকে প্রকশিত গ্রন্থ Ferdinand and Isabella. -তে এ দিনটিকে গ্রানাডা যুদ্ধের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অ্যাডওয়ার্ডের ওই ইতিহাস গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে এ সময় ইসাবেলা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে তার সেনাবাহিনীতে সৈন্য নিতে শুরু করে এবং তাদের কামান বিভাগকে আরো সুগঠিত করে সাজাতে তৎপর হয়। গ্রানাডা আক্রমণের মূল সমস্যা ছিল প্রকৃতি। অঞ্চলটা এমনভাবে দুর্গম প্রকৃতি দ্বারা বেষ্টিত ছিল যে সেখানে নতুন করে গিয়ে আক্রমণ করতে হলে অসাধারণ সেনাবাহিনী প্রয়োজন। ইসাবেলা দারুণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে দশ বছর ধরে যুদ্ধ করে তবেই মুসলিমদের স্পেন ছাড়া করতে পেরেছিল।

অ্যাডওয়ার্ডের বর্ণনা মতে, ইসাবেলা একবারে গ্রানাডা দখল করার মতো উচ্চাভিলাষ দেখায়নি। বরং সে মুসলিম সাম্রাজ্যটাকে ভেঙে ভেঙে একটু একটু করে দখল করে। ১৪৮৫ সনে রন্ডো এবং ১৪৮৬ সনে গ্রানাডার লজা দখল করে ইসাবেলার সেনাবাহিনী। লজা দখলের সময় গ্রানাডার শাসক দ্বাদশ মোহাম্মদকেও তারা বন্দি করে; কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়। ১৪৮৯ সনে দখল করে বাজা। এভাবে আস্তে আস্তে গ্রানাডার একেকটা অঞ্চল দখল করতে করতে শেষ পর্যন্ত ১৪৯১ সনে মূল গ্রানাডা আক্রমণ করে ঘেরাও করে ইসাবেলার সেনাবাহিনী। ফলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে দ্বাদশ মোহাম্মদ আত্মসমর্পণ করে।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত পেগি লিসের লেখা গ্রন্থ Isabel the Queen অথবা জন অ্যাডওয়ার্ডের লেখা পিয়ারসন এডুকেশন থেকে প্রকশিত গ্রন্থ Ferdinand and Isabella অথবা আই. এল. প্লাঙ্কেটের লেখা Isabel of Castile গ্রন্থ অথবা জোসেফ ও' কালাহানের লেখা কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ A History of Medieval Spain থেকে, যা জানা যায় ১৪৯২ সনের ২ জানুয়ারি ইসাবেলা এবং ফার্ডিনান্ড গ্রানাডায় প্রবেশ করে এবং দ্বাদশ মোহাম্মদের কাছ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে নগরের চাবি গ্রহণ করে।

ইতিহাসের এই পর্যায়ে যে কথাগুলো স্পষ্ট হয়। প্রথমত, কোনো রকম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ওই দিন ঘটেনি। এবং দ্বিতীয়ত, দিনটি ১ এপ্রিল ছিল না বরং দিনটি ছিল ২ জানুয়ারি। অর্থাৎ যে দিনটি সবার কাছে মুসলিম পুড়িয়ে মারার দিন হিসেবে প্রসিদ্ধ। তার তিন মাস আগেই গ্রানাডা বিজয় করে ক্রিশ্চিয়ানরা। এটা ঠিক, অত্যাচার তারা করেছিল। অ্যাডওয়ার্ডের বর্ণনা থেকে জানা যায়, মুসলিমদের সবচেয়ে বড় মসজিদটাকে তারা চার্চ বানিয়েছিল এবং অন্য ধর্মের মানুষদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল।

যদি এভাবেও এটাকে বিবেচনা করা হয় তবুও ওই দিনে কোনো হাসি-ঠাট্টায় অংশ নেয়া পুরোপুরি আত্মমর্যাদাহীনতার সমতুল্য।

কেননা এর মধ্যে তিন ধরনের গুনাহ রয়েছে। মিথ্যা : তা এমন এক খারাবি, যাকে অনেক স্বাভাবিক মনে করা হলেও তা বহু খরাবির মূল, একটা মিথ্যাকে সত্য সাব্যস্ত করার জন্য একাদিক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, মানবজীবনে তার বিশ্বস্ততা এবং মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যায়, যদিও সে সত্য কথা বলে তার পরেও মানুষ উহাকে মিথ্যাই মনে করে। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন

যে, সত্য অবলম্বন করো, এজন্য যে সত্যতা নেকির দিকে নিয়ে যায় এবং নেকি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, মানুষ সত্য বলে এবং সর্বদা সত্য বলতে বলতে সে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী লেখা হয়, মিথ্যা পরিহার করো, এজন্য যে মিথ্যা খারাবির দিকে নিয়ে যায় এবং খারাবি জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, মানুষ মিথ্যা বলে এবং সর্বদা মিথ্যা বলতে বলতে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী লেখা হয়। (বুখারী : ৫.২২৬১, হাদীস নং : ৫৭৪৩, মুসলিম : ২.২০১২, হাদীস নং : ২৬০৭)

অন্য হাদীসে আছে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম কে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড় বড় গুনাহের কথা বলব না? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মা-বাপের নাফরমানী করা এবং কোনো মানুষকে হত্যা করা, বর্ণনাকারী বললেন যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই হাদীস ইরশাদ করেন তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, ইহা বলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসে গেলেন যে, সাবধান মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা সাক্ষী (ও বড় গুনাহ) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বাক্য অধিকতর বলতেছেন যে, আমরা মনে মনে বলছিলাম সম্ভবত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুপ করবেন। (বুখারী : ৫/২২৩০, হাদীস নং : ৫৬৩২, মুসলিম : ১/৯১, হাদীস নং : ৮৮)

কিছু কিছু মানুষ অন্যকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে, এ সমস্ত মানুষের ব্যাপারে হাদীস শরীফে আছে, ধ্বংস ঐ সমস্ত লোকের জন্য, যারা মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। (আবু দাউদ : ২/৭১৬, হাদীস নং : ৪৯৯০)

কাউকে ধোঁকা দেওয়াও কম গুনাহ নয়? এক হাদীসে আছে, যে আমাদেরকে ধোঁকা দেবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসলিম : ১/৯৯, হাদীস নং : ১০১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : তোমরা আপন ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না এবং কারো সাথে ঠাট্টা করো না এবং কারো সাথে এমন ওয়াদা করো না, যা তুমি পূর্ণ করতে পারবে না। তিরমিজী : ৩৫৯/৪, হাদিস নং ১৯৯৫।

কুরআন শরীফে সব ধরনের বিদ্রূপ থেকেই নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, হে ঈমানদারগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে। সে (অর্থাৎ যাকে উপহাস করা হচ্ছে) তার চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। সে (অর্থাৎ যে নারীকে উপহাস করা হচ্ছে) তার চেয়ে উত্তম হতে পারে। (হুজরাত : ১১)

সাধারণভাবে এপ্রিল ফুলকে অহেতুক তামাশা মনে করা হয়, অথচ তা এমন নয়। যদি এর ইতিহাস এবং প্রেক্ষাপট দেখা হয় তাহলে এতে দেখা যায় মিথ্যা, ধোঁকা এবং বিদ্রূপের মতো গুনাহের কাজে মানুষ জড়িয়ে পড়ে, যা আল্লাহ এবং তার রাসূলের পছন্দ নয়। আরো একটি গুনাহ, যা ওই সমস্ত গুনাহ থেকেও ভয়াবহ মুসলমারদের কষ্ট দেয়ার গুনাহ। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, যারা মুমিন নর-নারীদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। (আহযাব : ৫৮)

এপ্রিল ফুলের ব্যাপারে ইসলামের বিধান স্পষ্ট। এই ব্যাপারে বৈধ করার কোনো সুযোগ নেই। সম্মানিত মুফতী সাহেবগণ এই ব্যাপারে দলিলভিত্তিক সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। হযরত মাওলানা আব্দুর রহিম লাজপুরী একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, এপ্রিল ফুল পালন করা নাসারাদের বৈশিষ্ট্য, মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য নয়। মিথ্যা বলা হরাম।

হাদীস শরীফে আছে, ওই ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য, যে বাকচিত্র করে অতঃপর মিথ্যা বলে মানুষকে হাসানোর জন্য, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। (আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড নং ২, পৃ. নং ৭১৬, হাদীস নং ৪৩৩৮)

ওই ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, হাদীসে আরো আছে যে, কোনো বান্দা পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে মিথ্যা বর্জন করবে, মিথ্যা চায় হাস্য–রসিকতা অথবা সংঘাতের জন্য হোক। (মুসনাদে আহমদ খণ্ড নং ২,পৃ. নং ৩৫২, হাদীস নং ৮৬১৫)

তা ছাড়াও বাস্তবতা এই যে মিথ্যা বলা বড়ই খেয়ানত। মিথ্যা বলা আমানতের পরিপন্থী, হাদীস শরীফে আছে, ইএটি সবচেয়ে বড় খেয়ানত যে তোমরা ভাইয়ের সাথে এ রকম বাকচিত্র করবে যে সে তোমাকে সত্য জানবে অথচ তুমি মিথ্যা বলছো। (আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড নং ২, পৃ. নং ৭১১, হাদীস নং ৪৯৭১)

মুসলিম জাতির জন্য উচিত যে এ রকম বাতিল, অনর্থক, শিষ্টাচারবহির্ভূত হাস্য-রসিকতা এবং মানুষের মর্যাদা পরিপন্থী প্রথা থেকে দূরে থাকা। ইহা ইসলামের চাহিদা ও যুক্তির অনুকূল।

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : রোজা

এ বি এম ফেরদৌস আলম
হিসাব বিভাগ
লি নভোটেক্স প্রা. লি.
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমি ২০০৭ এবং ২০০৮ সালের রমজান মাসের শেষের দিকে জ্বরে আক্রান্ত হই। উভয় রমজানে শেষের ৫টি করে মোট ১০টি রোজা রাখি। এটা অবশ্য সঠিক হিসাব নয়। ১০টির কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্য যে জ্বর ছিল তাতে কষ্ট করে হলেও রোজা রাখা যেত। বিশেষত ২০০৮ সালের রোজাগুলো। যেহেতু আখেরাতের ভয় তখন খুব বেশি ছিল না। তাই রোজা ভেঙে ফেলি এবং রোজার সঠিক হিসাবও রাখিনি। বর্তমানে আমাকে কতটি কাযা রোজা রাখতে হবে এবং কিভাবে রাখতে হবে?

সমাধান :

যতগুলো রোযা ছুটে গেছে বলে প্রবল ধারণা হয় ততগুলোর কাযা করাই যথেষ্ট, তবে দু-একটি রোযা বেশি রাখা ভালো। আর কাযা রোযা একত্রে বা সুযোগ মতে একটি একটি করে রাখারও অবকাশ রয়েছে। (এমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৩৯)

প্রসঙ্গ : বিয়ে

মুহা : মাহবুব আলম

জিজ্ঞাসা :

আমি আমার মামাতো বোনের মেয়েকে কি বিয়ে করতে পারি? এ ব্যাপারে পরামর্শ চাই।

সমাধান :

হ্যাঁ! আপনি আপনার মামাতো বোনের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন। (বাদায়িউস সানায়ে ৩/৪১১, সূরা নিসা-২৪)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহাম্মদ নোমান
খিলগাঁও, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

যদি কোনো ব্যক্তি সময়মতো নামায না পড়ে এবং নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়, তাহলে কি উক্ত নামাযের কাযা পড়তে হবে? অনুরূপভাবে বালেগ হওয়ার পর সাত-আট বছর নামায না পড়ে থাকলে তার কাযা পড়তে হবে? নাকি তাওবা ইস্তিগফারের দ্বারা মাফ হয়ে যাবে? এক ব্যক্তি বলল, কাযা পড়তে হবে না বরং তাওবা ইস্তিগফারের দ্বারাই মাফ হয়ে যাবে। কাযা বলতে কিছু নাই। তার এই উক্তিটি কতটুকু সত্য?

সমাধান :

শরয়ী কোনো ওজর ছাড়া সময়মতো নামায না পড়া মারাত্মক গুনাহ এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো ফরজ নামায ছুটে গেলে তা কাযা করা ফরয, আর ওয়াজিব নামায ছুটে গেলে তা কাযা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে বালেগ হওয়ার পর থেকে যত ফরজ ও ওয়াজিব নামায ছুটে গেছে সবগুলোর কাযা করা আবশ্যক। আর যদি অক্ষম হয়, তাহলে যতগুলোর কাযা করা সম্ভব, তা কাযা করবে বাকিগুলোর ব্যাপারে মৃত্যুর পর ফিদিয়া আদায়ের জন্য অসিয়ত করে যাবে। তাই শুধু তাওবা ইস্তিগফারের দ্বারা কাযা মাফ হবে না। তবে সময়মতো নামায আদায় না করার গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির উক্তি একেবারে ভিত্তিহীন ও কুরআন-হাদীসবিরোধী উদ্ভট বক্তব্য, যার কোনো ভিত্তি নেই। (বুখারী শরীফ ১/৮৪, আদ্দুররুল মুখতার ১/১০০)

প্রসঙ্গ : জানাযার পর দু'আ

হাফেজ মুহা : ইসমাঈন হুসাইন
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে মৃত ব্যক্তির জানাযা সমাপ্তের পর উপস্থিত মুসল্লিদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ পুনরায় দুই হাত তুলে মুনাজাত করা হয়। পক্ষান্তরে কোনো কোনো স্থানে জানাযার পর লাশ দাফনের আগে পুনরায় হাত তুলে মুনাজাত করাকে বিদআত হিসেবে আখ্যা দিয়ে মুনাজাত করা হয় না; কিন্তু তারা লাশ দাফনের শেষে মুনাজাত করেন।

প্রসঙ্গ : জুমু'আর দ্বিতীয় আযান

জিজ্ঞাসা-২

কিছু কিছু আলেম বলেন, জুমু'আর খুৎবার আযানের জবাব দেয়া যাবে আবার কিছু কিছু আলেম বলেন খুৎবার আযানের জবাব দেয়া যাবে না।

সমাধান-১

মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার নামাযই পূর্ণাঙ্গ দু'আ। জানাযার নামাযের পর পুনরায় সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করার প্রচলন ইসলামের স্বর্ণযুগে ছিল না। তাই তা বিদআত বলে গণ্য হবে, যা পরিহার করা জরুরি। তবে দাফনের পর দু'আ করার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (আবু দাউদ শরীফ ২/৪৫৯, কিফায়াতুল মুফতী ১/১৯৫)

সমাধান-২

নির্ভরযোগ্য মতানুসারে মৌখিকভাবে খুৎবার আযানের জবাব দেয়া নিষেধ। তবে দিতে চাইলে মনে মনে দেয়া উত্তম। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৬৫, আল বাহরুর রায়িক্ব ১/১৫১)

প্রসঙ্গ : যাকাত

আলহাজ্ব মুহাম্মদ রুহুল আমিন ভূঁইয়া
মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া, ডিআইটি রোড, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : ১

আমি আমার যাকাতের টাকা আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে মাদরাসার নামে অ্যাকাউন্ট করে রাখি। মাদরাসা ও এতিমখানা চালু হলে আমি এই যাকাতের টাকা লিল্লাহ বোডিংয়ে খরচ করব। এ সম্পর্কে আমি জানতে চাই–আমার যাকাত আদায় হবে কি না? যদি যাকাত আদায় না হয়ে থাকে, তাহলে যাকাত আদায়ের পদ্ধতি কী? যদি মাদরাসা হওয়ার পরে জমাকৃত যাকাতের টাকা লিল্লাহ ফান্ডে ব্যয় করি, তাহলে যাকাত আদায় হবে কি না?

সমাধান : ১

যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাতের টাকা ইত্যাদি যাকাত খাওয়ার উপযোগী ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি বিধায় মাদরাসা চালু হওয়ার পর লিল্লাহ বোডিংয়ে খরচ করার জন্য আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে যাকাতের টাকা জমা রাখার দ্বারা যাকাত আদায় হয়নি। তবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর জমাকৃত টাকা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত গরিব ছাত্রের ওপর তথা লিল্লাহ ফান্ডে শরীয়তসম্মত পন্থায় ব্যয় করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১৩০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৭০)

জিজ্ঞাসা : ২

যাকাতের টাকা দেরিতে ব্যয় করার কারণে আমাদের কোনো গুনাহ হবে কি না?

সমাধান : ২

নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী বছর অতিক্রম করার পর তাৎক্ষণিক যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। শরীয়ত সমর্থিত কারণ ছাড়া যাকাত আদায়ে বিলম্ব করলে গুনাহ হবে এবং আপনি যে উদ্দেশ্যে বিলম্ব করেছেন, তা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (হেদায়া ১/১৬৫, আদ্দুররুল মুখতার ১/১৩০)

প্রসঙ্গ : পবিত্র কুরআন

মাওলানা আব্দুল্লাহ
শিক্ষক, ওসমানীয়া মাদরাসা
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মাদরাসায় কিছু পুরনো কুরআন শরীফ ছিল, যা ছিঁড়ে ফেটে যাওয়ায় পড়ার উপযোগী না থাকায় পুড়িয়ে দাফন করে ফেলি। এমতাবস্থায় এলাকার কিছু লোক পড়ার অনুপযোগী কুরআনও পোড়ানো জায়েয নাই বলছেন। এখন পড়ার অনুপযোগী কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দাফন করা জায়েয আছে কি না?

সমাধান :

কুরআন শরীফের সম্মান প্রদর্শন ও তা হেফাজত করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। তাই পড়ার অনুপযোগী ফাটা-ছেড়া কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দাফন করা উচিত নয়। বরং হেফাজতের নিয়ম হলো কোনো পবিত্র, সংরক্ষিত ও নিরাপদ স্থানে পবিত্র কাপড়ের মধ্যে পেঁচিয়ে দাফন করা। (ফাতাওয়া শামী ১/১৭৭, ফাতাওয়া ওসমানী ১/১৯৪)

প্রসঙ্গ : শরয়ী পর্দা

মুহাম্মদ মাহবুব হাসান
টঙ্গী, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমার শাশুড়ি একজন পালক ছেলে এনেছিলেন ছেলেটির জন্ম হওয়ার সাথে সাথে। আমার শাশুড়ির ছোট বাচ্চার বয়স তখন ২ থেকে আড়াই বছর। আমার শাশুড়ির বাচ্চা (নিজের) ১ মাস দুধ পান করার পর দুধ পান করা বন্ধ করে দেয়। পালক ছেলেটি ২ দিন যাবৎ দুধ চোষে; কিন্তু কোনো দুধ পান করতে পারেনি। এখন এই পালক ছেলের সাথে তার বোন, অর্থাৎ আমার স্ত্রী দেখা করতে পারবে কি না?

সমাধান :

পালক ছেলেটি যদি আপনার শাশুড়ির স্তনের দুধ পান করা (যদিও সামান্য হোক) নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত না হয়, তাহলে উক্ত পালক ছেলের সাথে আপনার শাশুড়ির দুগ্ধতার সম্পর্ক স্থাপন না হওয়ার দরুন আপনার স্ত্রী তার সাথে দেখা দিতে পারবে না। (আল বাহরুর রায়িক্ব ৩/৩৭৬, আদ্দুররুল মুখতার মা'আশ শামিয়া ৪/৩৩৯)

প্রসঙ্গ : মহিলাদের জামাআতে নামায

মুহা : আব্দুল হামিদ
সিংড়া, নাটোর।

জিজ্ঞাসা :

আমি ও আমার সহকারী শিক্ষক প্রাচীরের সামনে কাতারবন্দি হই এবং

প্রাচীরের পেছনে পূর্ণ পর্দা অবস্থায় সকল ছাত্রী ও শিক্ষিকা কাতারবন্দি হয় এবং আমি ইমাম হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতে আদায় করি। এভাবে নামায আদায় করলে কোনো সমস্যা হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে মহিলাগণ জামাআতের সাথে নামায পড়ার ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট নন এবং কোনো হাদীস দ্বারা জামাআতের সাথে পড়ার ফযিলত প্রমাণিত নেই। বরং হাদীসে একাকী ঘরে পড়ার ফযিলত এসেছে। আর পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করা জরুরি, শরয়ী কোনো ওজর ব্যতীত ঘরে বা অন্য কোথাও জামাআত করা মাকরুহ। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। (সহীহুল বুখারী ১/৮৯, সুনানে আবী দাউদ ৮৪১)

প্রসঙ্গ : সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার পদ্ধতি

মুহা : রুহুল আমিন
মাদরাসা ইসলামিয়া দারুল হিফজ
শাহপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমরা যথারীতি সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াত করে আসছি। কিন্তু বর্তমানে এ বিষয়ে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। সমস্যাগুলো এই-اعـــــوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم তিনবার বলার পর এর সাথে بسـم اللـه الـرحـمـن الـرحيم মিলানো হয়। এখন আমার জানার বিষয় হলোتســـــــــمية মিলানো যাবে কি না? বিসমিল্লাহ মিলালে হাদীসে বর্ণিত সওয়াব পাওয়াব যাবে, নাকি তেলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যাবে?

সমাধান :

মুসলমানদের জন্য নবীজি (সা.)-এর আদর্শের অনুস্মরণই প্রকৃত উম্মতের পরিচয়। যে সহীহ হাদীসে সকাল-বিকাল সূরায়ে হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, সেখানে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা উল্লেখ নেই বিধায় তা না পড়া উত্তম। তা সত্ত্বেও কেউ পড়লে গুনাহ হবে না। (ফাতাওয়া হক্কানিয়া ২/১৯৭)

প্রসঙ্গ : ক্রয়-বিক্রয়

এইচ এম ফারুক
বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ এবং তা সর্বাবস্থায় বর্জনীয়; কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো কোনো ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রি করার সময় এভাবে মিথ্যা বলে যে, আমি উক্ত পণ্যটি ২০০ টাকায় কিনেছি। অথচ বাস্তবে সে পণ্যটি ১৫০ টাকায় ক্রয় করল। এখন প্রশ্ন হলো, মিথ্যা বলে ক্রেতা থেকে অতিরিক্ত যে টাকা আদায় করল, তা কি হারাম হবে? এবং এর কারণে মূল টাকাও কি হারাম হয়ে যাবে? এ সম্পর্কে শরীয়ত কী বলে?

সমাধান :

মিথ্যা বলে অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি করাতে যেমন গুনাহ হয়, তেমনি ব্যবসার বরকতও নষ্ট হয়ে যায়। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পণ্য বিক্রি করা পরিহারযোগ্য, তবে খরচসহ মিলিয়ে ক্রয়কৃত পণ্যের দাম বাড়িয়ে বলাতে গুনাহ হবে না। সর্বাবস্থায় বিক্রীত মালের মূল্য ব্যবসায়ীর জন্য হালাল বলে বিবেচিত। (রদ্দুল মুহতার ৫/১৩৭)

প্রসঙ্গ : পর্দা

মুহাম্মদ আমিন উল্লাহ
ক-৩২/ই, কুড়াতলী, ঢাকা-১২২৯।

জিজ্ঞাসা :

মেয়েরা পুরুষের নিকট কুরআন শিক্ষা নিতে পারবে কি না? পারলে কত বছর বয়স পর্যন্ত? মেয়েরা ছেলেদের পাশাপাশি মসজিদের মক্তবে পড়তে পারবে কি না? পারলে কত বছর বয়স পর্যন্ত?

সমাধান :

শরীয়তের নির্দেশানুযায়ী পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণকারীনী হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষ শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তদ্রূপ ছোট ছেলেদের সাথে লেখাপড়া করতে পারবে। পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্টকারীনী হওয়ার পর পুরুষ শিক্ষকের কাছে এবং ছেলেদের সাথে লেখাপড়া করার অনুমতি নেই। পড়ার ইচ্ছা থাকলে মহিলা শিক্ষিকা অথবা মাহরাম পুরুষের কাছে যত দিন ইচ্ছা পড়তে পারবে। (সুনানে আবী দাউদ ১/৭১, রদ্দুল মুহতার ১/৫৭৩)

প্রসঙ্গ : জানাযার নামায

মাওলানা মুবাশ্বির
বাহুবল, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

জানাযার নামাযে কাতার বেজোড় হওয়ার বিষয়টি কতটুকু সহীহ?

সমাধান :

জানাযার নামাযে তিন বা ততধিক বেজোড় কাতার করা মুস্তাহাব, হাদীস শরীফে বেজোড় তথা কমপক্ষে তিন কাতার হওয়াকে ফজিলতপূর্ণ বলা হয়েছে। (সুনানে তিরমিযী ১/২০০, আল ফিকহুল মুয়াস্‌সির-১৭২)

প্রসঙ্গ : ওয়ারাসাত

মুহাম্মদ মনজুর হুসাইন
উত্তর নামাপাড়া, খিলক্ষেত, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে ১.৬৮

শতাংশ জমি পেয়েছে এবং আমরা আমার স্ত্রীর বড় বোনের ১.৬৮ শতাংশ যৌথভাবে কিনেছি। যার মোট মূল্য ৬.৫ লাখ টাকার মধ্যে ৬ লাখ পরিশোধ করা হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এই জমি রেখে দেব। যদি কোনো কারণে আমার শাশুড়ির টাকা প্রয়োজন হয়, তবে জমি বিক্রি করে টাকা দেব। কিন্তু বর্তমানে আমরা বুঝতে পারছি, ওই জমি সংরক্ষণ করা যাবে না আমার শ্বশুরের ভাইদের জন্য। এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন হলো, আমার স্ত্রীর ১.৬৮ শতাংশের ওপর যাকাত দিতে হবে কি না? স্ত্রীর বোন থেকে কেনা (৬.৫ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকা বাকি আছে) অংশের ওপর যাকাত দিতে হবে কি না? যাকাত যদি দিতে হয়, তবে কোন মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত দিতে হবে?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত জমিদ্বয় যেহেতু ব্যবসায়িক জমির অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় সেগুলোর ওপর যাকাত ফরয হবে না। (বাদায়িউস সানায়ে ২/৩৯৫)

প্রসঙ্গ : ক্রয়-বিক্রয়

মুহাম্মদ আব্দুর রহিম
নিরাপত্তা পরিদর্শক
বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।

জিজ্ঞাসা :

দোকানে যদি আমি কোনো খরিদার পাঠাই এবং সেই দোকানদার তার কাছে মাল বিক্রি করল। দুই দিন পর সেই দোকানদার আমাকে ৪ হাজার টাকা দিল, সেই টাকা আমার জন্য নেওয়া জায়েয হবে কি না?

সমাধান :

বিনিময় নির্ধারিত করে দালালির চুক্তি হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত বিনিময় বৈধ, অন্যথায় নয়। প্রশ্নোক্ত সুরতে বিনিময় নির্ধারিত না হওয়ায় তা আপনার জন্য বৈধ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৬/৬৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/১১৬)

প্রসঙ্গ : ওজু

মুহাম্মদ মাহবুব মোস্তফা
শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

কেহ মগ থেকে এভাবে হাত দিয়ে পানি নিয়ে ওজু করল যেভাবে হাউজ থেকে হাত দিয়ে পানি নিয়ে ওজু করা হয় অথবা, এমনিভাবে বালতি থেকে কয়েকজন একই সাথে পৃথক পৃথকভাবে ওজু করল এমতাবস্থায় পানি এবং ওজুর হুকুম কী?

সমাধান :

নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় পানি পাক ও ওজু সহীহ বিবেচিত হবে। (আল বাহরুর রায়িক্ব ১/১৬৫, বাদায়িউস সানায়ে ১/৩৯৭)

প্রসঙ্গ : সংগীত

মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
পল্লবী, ঢাকা-১২১৬।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদে বার্ষিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেখানে ইসলামী হামদ-নাত ও ইসলামী সংগীতেরও আয়োজন করা হয়। সংগীত চলাকালে মিউজিক লাইট অর্থাৎ যে লাইট জ্বালালে গোটা মসজিদে বিভিন্ন রঙের আলো চমকাতে থাকে এবং এ সময়ে অন্যান্য লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো মসজিদে হামদ-নাত, অনুষ্ঠান, মিউজিক লাইট ব্যবহার কার জায়েজ আছে কি?

সমাধান :

বর্তমান সমাজে প্রচলিত ইসলামী সংগীত অনুষ্ঠানে বহুবিদ শরীয়ত গর্হিত কর্মকাণ্ড বিদ্যমান। তার অন্যতম হচ্ছে মিউজিক লাইটের মতো অপচয়। বিধায় এ ধরনের অনুষ্ঠান যেকোনো স্থানে করা আপত্তিকর। বিশেষ করে মসজিদের মতো স্থানে তো একেবারে অনুমতি দেয়া যায় না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৮২)

প্রসঙ্গ : ওয়ারাছাত

মুহা. মুছাব্বির আহমদ খান
আজমপুর (জয়নাল মার্কেট)
দক্ষিণখান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি আবেদনকারীর ১২৭৮২ নং দাগের জমিতে আমার দাদা (১৯৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন) ও দাদি (১৯৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন) তাহাদের ২টি কবর বিদ্যমান, উক্ত জমি আমাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন, উক্ত দাগের চারিদিকের নকশায় চিহ্নিত দাগসমূহের জমিতে ১১তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণ করলে দাদা ও দাদির কবরস্থান দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার ইত্যাদি করার জন্য যাতায়াতের কোনো প্রকার রাস্তা থাকবে না। এমতাবস্থায় আমার দাদা ও দাদির কবর অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি না? যদি যায় তবে কিভাবে তা সম্পাদন করতে হবে? যদি না যায় তবে কবর ব্যতীত অন্য জায়গা কী করব?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজ জমিতে দাফনকৃত লাশ স্থানান্তরিত করার অবকাশ নেই। তবে এ ধরনের মালিকানাধীন জমিতে দাফনকৃত লাশ দীর্ঘদিনের পুরনো হওয়ায় মাটির সাথে মিশে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে কবর নিশ্চিহ্ন করে উক্ত জমিতে প্রয়োজনে বাড়িঘর নির্মাণের অনুমতি আছে। (ফাতহুল ক্বদীর ২/১০১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৭/৭৭)

ইসলামে মানবাধিকার-২

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

২। মায়ের গর্ভে সন্তানের হক :

ইসলামে মানুষের অধিকার আরম্ভ হয় মায়ের গর্ভ থেকেই। সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই ইসলাম বলে একে তোমরা হত্যা করো না। এ ক্ষেত্রে তাকে শুধু জীবনের হক দিয়েছে, তা নয় বরং মীরাসের হকও দেওয়া হয়েছে।

اخبرنى عطاء ان سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه، ثم توفى، وامرأته حبلى لم يعلم بحملها، فولدت غلاما فارسل ابوبكر وعمر فى ذلك الى قيس ابن سعد بن عبادة قال انا امر قسمه سعد وارضاه فلن اعود فيه ولكن نصيبى له قلت اعلى كتاب الله قسم، قال لا نجدهم كانوا يقسمون الا على كتاب الله۔

আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত, হযরত সা'আদ ইবনে উবাদা নিজের যাবতীয় সম্পত্তি সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে সিরিয়ার সফরে গমন করলেন। এরপর তাঁর ওফাত হয়। ওফাতের সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন সন্তানসম্ভবা। কিন্তু হযরত সা'আদের এ খবর ছিল না। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) হযরত সা'আদের ছেলে কাইস ইবনে সা'আদের নিকট খবর পাঠালেন যে, সা'আদ নিজের ইন্তেকালের সময় গর্ভের সন্তান সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এখন আমাদের খেয়াল হলো তাঁর সম্পদে এই সদ্যজাত সন্তানের প্রাপ্য অংশ রয়েছে। তাকে তা প্রদান করা আবশ্যক। উত্তরে কায়স ইবনে সা'আদ বলেন, আমার পিতা যেভাবে সম্পদ বণ্টন করেছেন এবং সেভাবে তা কার্যকরও হয়ে গেছে, তাতে পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে আমার অংশ আমি এই সদ্যজাতকে দেব। ইবনে জুরাইজ আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত সা'আদ কি সম্পদ বণ্টন পবিত্র কুরআন মতেই করেছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, সাহাবায়ে কেরাম পবিত্র কুরআন মতেই বণ্টন করে থাকেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৯/৯৯, ইবনে হাজাম মহল্লী ৯/১৪২, কানযুল উম্মাল ১১/২৩, আলমুগনী ২৭৭)

হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان ابابكر الصديقؓ نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يابنية مامن الناس احد احب الى غنى بعدى منك ولا اعز على فقرا بعدى منك وانى كنت نحلتك من مالى جداد عشرين وسقافلو كنت جددتيه و احتزتيه كان لك ذالك وانما هو مال الوارث وانما هو اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله فقالت يا ابت والله لو كان كذا وكذا لتركته انما هو اسماء فمن الاخرى قال ذو بطن بنت خارجة اراها جارية۔

হযরত আবু বকর (রা.) গাবা নামক স্থানের খেজুর বাগান থেকে বিশ ওয়াসাক (এক ওয়াসাকে সাড়ে ষাট সা' আর এক সা' হলো সাড়ে তিন সের) পরিমাণ খেজুর তাঁকে (হযরত আয়শা (রা.)-কে হেবা হিসেবে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেন। ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে তিনি হযরত আয়শা (রা.)-কে ডেকে বললেন, দুনিয়ায় আমার জন্য তোমার মতো প্রিয় কেউ নেই, আমার পরে তোমাকে হারানোর ব্যথার চেয়ে বড় ব্যথা আমার জন্য আর কিছু নেই। আমি বিশ ওয়াসাক খেজুর তোমাকে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি। যদি তুমি এ খেজুর পেড়ে ফেল এবং স্তূপ বানিয়ে নাও তাহলে তোমার। কিন্তু আজকের পর থেকে এই খেজুর ওয়ারাসাতের সম্পদ। এগুলোর মধ্যে ওয়ারেছ হবে তোমার দুই ভাই এবং দুই বোন। তাই আমার পরে এই পরিত্যক্ত সম্পদ পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত পন্থায় ভাগ করে নেবে। হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন, আব্বাজান! আপনি যদি আমাকে এর চেয়েও বেশি সম্পদের মালিক বানিয়ে দিতেন, তাও আমি ওয়ারেছদের বণ্টনের খাতিরে পরিত্যাগ করতাম। আব্বাজান! আমার এক বোন তো আসমা, আরেক বোন কে? তিনি বললেন, ذوبطن بنت خارجه ارها جارية আমার স্ত্রীর গর্ভস্ত সন্তান। মনে হচ্ছে সে মেয়েই হবে। (আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৬/১৬৯, হা. ১১৭৬৮, মুআত্তা মালেক ২/৭৫২ হা. ১৪৩৮, তাহাবী ৪/৮৮)

৩। পরস্পর সম্মানবোধের অধিকার :

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রবর্তিত সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরস্পর সম্মান, ইজ্জত ও মূল্যবোধের অধিকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক লোকের মর্যাদা ও সম্মানের অধিকার প্রবর্তন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

انزلوالناس منازلهم

মানুষের সাথে নিজ নিজ মর্যাদা ও স্তর হিসেবে আচরণ করো। (সুনানে আবী দাউদ ৪/২৬১ হা. ৪৮৪২, সহীহে মুসলিম ১/৬ ইত্যাদি)

কুরাইজা গোত্র যখন হযরত সা'আদ ইবনে মু'আজের নির্দেশে কিল্লা থেকে বের হওয়ার কথা মঞ্জুর করলেন তখন হযরত সা'আদ (রা.) সেখানে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে

বলেন–

قوموا الى سيدكم

নিজেদের সরদারের জন্য দাঁড়াও। (সহীহে বুখারী ২/৯০০, ৩/১১০৭, সহীহে মুসলিম ৩/১৩৮৮ হা. ১৭৬৮ ইত্যাদি)

মানুষের সাধারণ জীবনযাপনেও পরস্পরের সম্মান বোধের প্রতি ইসলাম এমন গুরুত্ব দিয়েছে, যার নজির পাওয়া যায় না। কারো সম্মান বোধে সামান্যতম আছর পড়ুক, অবহেলা হোক, তা ইসলাম কখনও চায় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث۔

"তোমরা যখন তিনজন একত্র হবে তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুজন পরস্পর কানাকানি করো না। (সহীহে বোখারী ৫/২৩১৮ হা. ৫৯৩০, সুনানে কুবরা ৩/২৩২, হা. ৫৬৮৮, সহীহে মুসলিম ৪/১৭১৭, ১৭১৮ ইত্যাদি)

৪। ইজ্জত সংরক্ষণের অধিকার :

ইসলামী রাষ্ট্রে বর্ণ, ধর্ম, বংশ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভাব নির্বিশেষে প্রত্যেক লোকের জন্য মানুষ হিসেবে একটি মর্যাদা সংরক্ষিত আছে। যা কোনো সমাজ, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় খর্ব করতে পারে না। এটি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। প্রত্যেক নাগরিকের আপন আপন সম্মান ও ইজ্জত সংরক্ষণ করা। এমন কোনো আইন-আদালতের অধিকার নেই, যা তার এই অধিকার খর্ব করবে। ইসলাম শুধু রাষ্ট্র নয় বরং প্রত্যেক নাগরিককে পরস্পরের ইজ্জত সংরক্ষণের দায়িত্বশীল মনে করে। এমন কোনো পদক্ষেপ বাস্তবায়ন হতে দেয় না, যাতে কোনো নাগরিকের ইজ্জত ও মান ক্ষুণ্ন হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারীনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এমন কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই জালিম। (হুজরাত ১১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

মুমিনগণ, তোমরা বিবিধ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। (হুজরাত ১২)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতদ্বয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিম সমাজে কারো ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং অসম্মান, সমালোচনা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা এবং কারো অভ্যন্তরীণ ও ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক না গলানো, যা বড় পাপ ও অপরাধ বলে বিবেচিত।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্মান সংরক্ষণের নিমিত্ত পবিত্র কুরআনে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটানোকে অপরাধ এবং গুনাহ বলা হয়েছে।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান। (সূরায়ে নূর ৪)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। (আহযাব ৫৮)

৫। স্বকীয়তা রক্ষার অধিকার :

ইসলাম প্রত্যেক লোকের আপন আপন গোপনীয়তা ও স্বকীয়তা রক্ষার অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় পরস্পরের ব্যক্তিগত ও স্বকীয় বিষয়ের প্রতি নাক গলানো এবং দোষ-ত্রুটি খোঁজা থেকে নিষেধ করেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

মুমিনগণ, তোমরা বিবিধ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার গোস্ত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (হুজরাত ১২)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
“আল-আবরার” এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩